উচ্চ শিক্ষা : কিছু কথা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

উচ্চ শিক্ষা : কিছু কথা

উচ্চ শিক্ষা : কিছু কথা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

কাকলী প্রকাশনী

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৩

প্রচ্ছদ
খালেকুজ্জামান এলজি

অক্ষর বিন্যাস
মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
কম্পিউটার গ্যালাক্সী
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫/৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম ১৫০ টাকা

ISBN 984-437-301-8

বাংলাদেশের সেইসব জনগণের উদ্দেশ্যে
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাদের অবদান অনস্বীকার্য
কিন্তু যাদের সন্তান-সন্ততিরা দারিদ্র্যের কারণে
উচ্চশিক্ষার সিংহদ্বারে পৌঁছাতে পারছে না।

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা শেষ করে আমি পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিই। তবে এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ যত পরিচ্ছন্ন হবে বা পথ যত কুসুমাস্তীর্ণ হবে ভেবেছিলাম, প্রকৃত অবস্থা তার থেকে বেশ আলাদা লক্ষ করেছি। আমার ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি স্থান যেখানে পণ্ডিতজনেরা অগ্রবর্তী চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক হবেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষকই জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার কাজে সব সময় নিয়োজিত রয়েছেন হয়তোবা, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষাসমস্যা নিয়ে আমি কখনও কখনও লিখেছি বা আলোচনা সভায় নিবন্ধ পাঠ করেছি। এগুলো কোনো সময় মুদ্রিত করা হবে এমন কথা ভাবিনি। যখন এগুলো পুস্তাকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই তখন সবগুলো খুঁজে পাওয়া ছিল খুব দুরূহ। যেগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে সেগুলো এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমার ইংরেজি ভাষায় লেখাগুলি অন্য একটি পুস্তকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ পুস্তকের বৃহদাংশ জুড়ে আছে উপাচার্য থাকাকালীন আমার দেওয়া বক্তৃতাবলী। সিনেট বক্তৃতাসহ আনুষ্ঠানিক যখনই কোন বক্তৃতা আমি দিয়েছি তা আমি নিজেই আমার সাঁটলিপিকার জনাব আলাউদ্দীনের সাহায্যে তৈরি করতাম, যদিও এসব বক্তৃতার মালমশলা বিভিন্ন সূত্র থেকে পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করা হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিশেষ করে এ প্রতিষ্ঠানের সিনেটের কার্যাবলী সম্পর্কে জনগণের জানবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সে বোধ থেকেই সিনেট সভায় দেয়া আমার অভিভাষণগুলি মুদ্রিত করা হয়েছে। পুস্তকের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত বিশেষ সিনেট অধিবেশনের কার্যাবলীও সংযোজিত করা হয়েছে। কিভাবে উপাচার্যের প্যানেল তৈরি করা হয় এ নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন আছে। প্রক্রিয়াটি যে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তা জানা বৃহত্তর জনগণের প্রয়োজন। সিনেটের বক্তৃতাবলী ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণী যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছে তবুও এগুলি এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছি।

উপাচার্য থাকাকালীন গণিত বিভাগ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক মুনিবুর রহমান চৌধুরী। ফজলুল হক হল সম্পর্কে আমি কিছু তথ্য পেয়েছিলাম হলের প্রভোস্ট ড. জাফর মাহমুদের কাছে। আমার এ দু'জন শিক্ষক সহকর্মীকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। উপাচার্যের কার্যালয়ের জনাব আলাউদ্দীনের সাহায্য না পেলে কোন বক্তৃতাই রচনা করা সম্ভব হতো না। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাপ্তাহিক ঢাকা ডাইজেস্ট এবং রোববারের সাংবাদিক ও সম্পাদকগণ আমার সাক্ষাতকার মুদ্রিত করে বিভিন্ন বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছেন এ জন্য তাঁদের জানাচ্ছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। একজন পেশাদার প্রুফরিডার এ পুস্তকের প্রুফ দেখে দিয়েছেন। তিনিও আমার ধন্যবাদের পাত্র। কাকলী প্রকাশনীর জনাব এ কে নাছির আহমেদ সেলিম আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন নিবন্ধ, বক্তৃতা বা সাক্ষাতকারের মাধ্যমে আমার দেয়া মতামতগুলো যদি আগ্রহী পাঠকবৃন্দ সহৃদয়ে গ্রহণ করেন তাহলে আমি বাধিত হবো।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

সূ / চি / প / ত্র

প্রবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো পরিবর্তন প্রসঙ্গে / ১৩
বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন-জট ও তার প্রতিকার / ২০
ভাষা নিয়ে কথা / ২৭

বক্তৃতা

বাংলাদেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা : কিছু কথা / ৩৫
গণিত বিভাগের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে উপাচার্যের বক্তৃতা / ৪৬
ফজলুল হক হলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ / ৫১
ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ / ৫৫
বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৯০ / ৬২
সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ, ১৯৯১ / ৭০
সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ, ১৯৯২ / ৮৮

সাক্ষাৎকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার
ঢাকা ডাইজেস্ট পত্রিকার সাথে একটি একান্ত সাক্ষাতকার / ১০৩
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট : সমাধান কীভাবে
সাপ্তাহিক রোববারের একটি সাক্ষাৎকার / ১২৪

পরিশিষ্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশন—১৯৯০ / ১২৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো পরিবর্তন প্রসঙ্গে*

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা উচ্চতর শিক্ষা বলতে আমরা এখানে যা বোঝাচ্ছি তা হলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা। বর্তমানে আমাদের দেশে এ শিক্ষা দেয়া হয় ডিগ্রি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আমরা অবশ্য আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি কেবলমাত্র ঐ উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যা সাধারণভাবে অভিহিত হয়ে থাকে General Education নামে, অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলো এ প্রবন্ধের আওতা থেকে বাদ থাকছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রথমেই দেখা যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যেন এক ঝলক আলো যা দূর করে মনের ও পরিপার্শ্বের সব অন্ধকারকে আর পথ দেখায় বহুদূরের দিগন্তের। চিন্তার মুক্তি, বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ আর বিবেকের বিবর্তন তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রধান অবদান। অবশ্য তত্ত্বালোচনার মধ্যে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে আমরা সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে ধরে নিতে পারি : যে জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছিল স্কুলে, তার পুনর্বর্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে, যে প্রশ্নগুলো অবোধ্য ছিল স্কুলের চার দেয়ালের মাঝে তার সমাধান যেন খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আর এক দিক, তার ব্যবহারিক দিক যা মোটেই ছোট করে দেখা চলবে না। আজকের দুনিয়ায় প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে পারবে এমন জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের ফলেই আত্মপ্রত্যয় লাভ করে ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী, আবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই পরবর্তী জীবনের সৃজনশীল সাংবাদিক, কুশলী, বাণিজ্য-প্রশাসক, দক্ষ কূটনীতিবিদ ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সৃষ্টির সহায়ক।

---

* প্রবন্ধটি ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে পঠিত ও পরবর্তী পর্যায়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

অবশ্য জ্ঞান বিতরণ করাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য নয়, জ্ঞান সৃষ্টিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যদি জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত না হয়, জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত না হয় তাহলে তো তার ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে শীঘ্রই। আর তাই গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান, যে গবেষণা সুবিস্তৃত করবে জ্ঞানের পরিধিকে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে একটি কথা বলে রাখা দরকার। আমরা এদেশে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার শপথ নিয়েছি, যে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হবে সুযোগের সম-অধিকার। দেশের শিক্ষানীতিও এই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে আমরা সাধারণভাবে তাই আশা করতে পারি। একটি সম সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতিগুলো কি? প্রথমত, সকলের লেখাপড়া করার সমান ও বৈষম্যহীন অধিকার স্বীকার ও তার জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধাভোগী শিক্ষিত ব্যক্তি ও দেশের আপামর জনগণের মধ্যে আয়ের অসমতা দূরীকরণে সাহায্য করবে ও দেশকে সম-সমাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ পরিস্ফুটন হয়। তৃতীয়ত, জীবনের সাথে শিক্ষার সমন্বয়সাধন। রেনেসাঁস যুগের ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম কাজ ছিলো 'ভদ্রলোক' সৃষ্টি করা, যে ভদ্রলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেন কেবল আর্থিক সচ্ছলতার জোরে। সমাজকে দেবার তাদের কিছুই ছিল না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে আজও এ রাহুমুক্ত হয়নি। কিন্তু জীবনের সাথে সমন্বয়হীন শিক্ষাদান সম-সমাজের দেশে অচল—তা কিছু সামাজিক পরগাছা সৃষ্টি করে কিন্তু সমাজের কল্যাণে আসবে এমন মানুষ সৃষ্টি করে না। চতুর্থত, জীবনের আর সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় রোধও হবে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। অপচয় রোধ সম্ভব তখনই যখন সবকিছু পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে, যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ।

উচ্চতর শিক্ষার বর্তমান রূপ

এক্ষণে দেখা যাক আমাদের উচ্চতর শিক্ষার বর্তমান রূপ কি। এ ক্ষেত্রে দুটি প্রধান প্রবাহ রয়েছে—একটি পাস ও অপরটি অনার্স। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর কিছুসংখ্যক ছাত্র আসেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আর অধিকাংশই ভর্তি হন দেশের বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজগুলোতে। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তাঁরা তিন বছর অধ্যয়নের পর সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এক বছর অধ্যয়নের পর মাস্টার্স ডিগ্রির অধিকারী হন। যাঁরা কলেজে ভর্তি হন তাঁরা

দু'বছরের মাথায় স্নাতক (পাস) ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দু'বছর অধ্যয়নের পর মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করার আগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ও ছাত্র প্রতি ব্যয়ের তুলনামূলক অবস্থা কিরূপ তা দেখা দরকার। নিচের সারণী দুটি থেকে এর একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা ১৯৬৯-৭০	মোট শিক্ষক ১৯৬৯-৭০	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত
ডিগ্রী কলেজ সমূহ	২১০০০০	৪২০০	১ঃ৫০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮১৫১	৩৬৬	১ঃ২২

ছাত্র প্রতি ব্যয়ের হিসাব

প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা ১৯৬৯-৭০	মোট ব্যয় ১৯৬৯-৭০	ছাত্র প্রতি ব্যয়
ডিগ্রী কলেজসমূহ	২১০০০০	৪৬.৫ মিলিয়ন টাকা	২২০ টাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৮১৫১	২৩.৫ মিলিয়ন টাকা	২৮৭৮ টাকা

সারণী দু'টো স্বতঃব্যাখ্যাত অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজগুলোর তুলনায় ছাত্র প্রতি ১৩ গুণ অর্থব্যয় করেও ছাত্রছাত্রীদের সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিতে সক্ষম হইনি। এ অবস্থায় কলেজগুলো যে কত দুর্দশাগ্রস্ত তা সহজেই অনুমেয়।

উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ

এই শিক্ষাব্যবস্থা নানা দোষে দুষ্ট। প্রথম ত্রুটি হিসেবে বলা যেতে পারে বৈষম্যমূলক দ্বিপ্রবাহী শিক্ষাব্যবস্থার কথা ঃ পাস এবং অনার্স। ইউরোপেও কোনো কোনো দেশে দ্বিপ্রবাহী শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, যেমন ব্রিটেন ও নরওয়েতে। কিন্তু ঐ সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তফাৎ রয়েছে প্রচুর। ব্রিটেনে যাঁরা পাস ডিগ্রির জন্য পড়েন তাঁদের অনার্স পড়ার যোগ্যতা নেই এমন কথা সব সময়ে বলা যায় না। যাঁরা একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে

জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে চান বা শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোনো পেশায় ভবিষ্যতে নিজেদের নিয়োজিত করতে চান তাঁরা স্বেচ্ছায় পাস কোর্সে ভর্তি হন। তা ছাড়া এক বছর এমনকি দুই বছর পাস কোর্সের পাঠ্যসূচি অনুসরণের পরেও একজন ছাত্র অনার্স কোর্সে যোগ দিতে পারেন। নরওয়েতে বিশেষ করে কলা বিভাগে, দু'ধরনের স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হয়—একটি, ছাত্রোত্তর জীবনে যাঁরা শিক্ষক হতে চান তাঁদের জন্য, অন্যটি বাকি অন্যান্যদের জন্য। দুই ডিগ্রির মধ্যে মানগত বিশেষ একটা পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে বা ব্যবহারিক জীবনে অর্থোপার্জনের দিক থেকেও বিশেষ একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ডিগ্রি নির্বাচনটি সেখানে নির্ভর করে ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরে।

আমাদের এখানের পাস ও অনার্স-এর মধ্যে কিন্তু এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দুটি ধারা সম্পূর্ণ সমান্তরাল। তাই পাস থেকে আসা ছাত্রের এম.এ/এম.এসসি ডিগ্রি অনার্সের ছাত্রের এম.এ/এম.এসসি ডিগ্রির সমমানের বলে গণ্য হয় না। অথচ অনেক ছাত্রই কেবলমাত্র আর্থিক কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর গোড়ায় আসতে পারে না, তার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ঘাটতির জন্য নয়।

দ্বিতীয়ত, কি পাস, কি অনার্স দুটি ডিগ্রির একটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যেমন দেখতে পাই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের এখানে পাস ডিগ্রি পেতে হলে দু'বছর কলেজে পড়াশোনা করতে হয়। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর কোথাও দু'বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি পাওয়া যায় না—যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি পেতে সময় লাগে চার বছর আর ব্রিটেন ও ফ্রান্সে তিন বছর। ফ্রান্সে কখনও কখনও চার বছর। আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলো নিম্নমানের হওয়ায় যখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ছাত্রছাত্রীরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তখন ইউরোপের সমপর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে থাকেন অনেকখানি। এর পরে দু'বছরের কলেজে উচ্চশিক্ষা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না—এ কথা ছাত্র, অভিভাবক, চাকুরিদাতা আর আমরা সবাই জানি। আর তাই পাস ডিগ্রির দাম খুব কম। এ কারণে পাস ডিগ্রি লাভের পরেও ছাত্রছাত্রীরা আবার ভীড় করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য।

অনার্সেরও একই অবস্থা। এর পাঠ্যসূচির বিন্যাস এমনই যে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর স্বাভাবিকভাবেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রির কথা চলে আসে।

ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু এমনটি নয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রির পরে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই দ্বিতীয় ডিগ্রি লাভ করার প্রয়োজন মনে করেন না। সাধারণভাবে ছাত্রোত্তর জীবনের অধ্যাপক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরাই কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি জীবনের সাথে এ সম্পর্কহীন এবং সেহেতু অপচয়ী। শিক্ষাকে যদি আমরা "Investment in human resources" বলে ধরে নি তবে আমাদের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা এ ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ। আমাদের এখানে বেশির ভাগ ছাত্রই আসেন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, নিছক একটি ডিগ্রি লাভের আশায়। আবার প্রায়শই এও দেখা যায় যে বৈষয়িক বা অন্য কোনো কারণে কেউ কেউ এমন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করছেন যার সাথে তাঁর পূর্ব শিক্ষার সম্পর্ক খুবই কম। তাই দেখতে পাই রসায়ন শাস্ত্রের এম.এস.সি ডিগ্রি ধারীকে সরকারি প্রশাসক হিসেবে বা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এম.এ. কে তামাক কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে বা ইতিহাসের এম.এ.কে রেলের ট্রাফিক অফিসার হিসেবে। ভূগোলের এম.এস.সি ডিগ্রি ধারীর বিলেতে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং পড়তে যাওয়া বা ইতিহাসের এম.এ. ডিগ্রি ওয়ালার শিপিং পড়তে যাওয়া বোধ করি জীবনের সাথে সম্পর্কহীন এবং অপচয়ী শিক্ষাব্যবস্থার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি এঁদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির কোনো প্রয়োজন ছিল? এরূপ অপচয়ী শিক্ষা নিশ্চয়ই ইপ্সিত সমাজব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সংস্কারের উপায়

কিভাবে এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা যেতে পারে। প্রথমত, পাস ও অনার্সের ব্যবধান উঠিয়ে দিয়ে একই রকম ডিগ্রি প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত, চার বছরের এম.এ. ডিগ্রির পরিবর্তে তিন বছরের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রির প্রবর্তন করাও আশু প্রয়োজন। তৃতীয়ত, কলেজগুলোতেও এই ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি ও তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, এই ডিগ্রির পাঠ্য বিষয় নতুন করে রচনা করতে হবে, যেন তা পূর্ণাঙ্গ হয় এবং সাধারণ শিক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতর ডিগ্রি হবে প্রধানত একটি গবেষণা ডিগ্রি এবং যা অর্জন করতে অন্তত পক্ষে ২ বছরের পড়াশোনা ও গবেষণার প্রয়োজন হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে পরিবর্তিত অবস্থায় প্রথম ডিগ্রি লাভের পরে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই আর দ্বিতীয় ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন না। অবশ্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও থাকতে পারে যেখানে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত লোকদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে।

যে ধরনের সংস্কারের কথা এখানে বলা হয়েছে তার কিন্তু কিছু পূর্বশর্ত আছে যা পূরণ না হলে কোনো সংস্কারই কার্যকর হবে না। প্রধান শর্তগুলো হলো কলেজগুলোর

উন্নয়ন ও পাঠ্যসূচির পুনর্বিন্যাস। বেশির ভাগ কলেজ এমনিতেই উন্নত নয় তদুপরি যদি সেখানে তিন বছর মেয়াদী ও অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের ডিগ্রি ক্লাশ খোলা হয় তবে তাতে খুব সুফল নাও হতে পারে, শিক্ষার মান আরো নিচু হওয়ার সম্ভাবনা। তাই কলেজগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন অপরিহার্য। কোনো কোনো কলেজে বেশ কিছু উপযুক্ত শিক্ষক আছেন কিন্তু সংখ্যায় হয়তো বা তারা খুব কম। তাই শিক্ষক-প্রশিক্ষণ হবে একটি প্রধান কর্তব্য। এর সঙ্গে সঙ্গে আসবে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরী উন্নয়নের কথা ও আনুসঙ্গিক অনেক কিছুর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের বিষয়। এ জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং এ পরিকল্পনা এমন হবে যেন বেশ কিছুসংখ্যক কলেজ বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে।

নতুন ব্যবস্থার তিন বছরের ডিগ্রির মান অন্তত বর্তমানের অনার্স ডিগ্রির অপেক্ষা নিম্নস্তরে যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অবশ্য অনার্সের পাঠ্যসূচির বেশ কিছুটা রদবদল করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অনার্সের পাঠ্যসূচিতে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় খুব বেশি, এতে হয়তো ঐ বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে। তাও সব ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু সাধারণভাবে প্রসারতার দিক থেকে তা খুবই সামান্য। এ ধরনের পাঠ্যসূচি যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে তার জন্য মোটেই উপযোগী নয়। নতুন ব্যবস্থার জন্য পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা গভীরতা ও প্রসারতার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এ বিষয়ে সাসেক্স প্রভৃতি ৬০-এর দশকের ব্রিটেনের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর "School system" ও তার পাঠ্যক্রমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

শিক্ষাকাঠামো পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথাও আসে। কিন্তু এ দুই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে বলে আমরা এখানে ওগুলোর আলোচনা করছি না।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা-কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন অবশ্য কখনও সফল হবে না যদি যুগপৎভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সংস্কার ও তার মানোন্নয়ন না হয়। নিচের স্তরে পরিবর্তন না করে কেউ যদি কেবল উপরের সংস্কার করতে চান তবে সে ব্যবস্থা উল্টানো পিরামিডের মতোই হবে অস্থির ও অস্বাভাবিক।

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা হবে সর্বাত্মক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশবিশেষ এবং জাতীয় জনশক্তি পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিবর্তন এ প্রবন্ধে সূচিত হয়েছে তা কার্যকর

হলে সুফল হবে অনেক। চার বছর মেয়াদী অর্ধ শিক্ষার পরিবর্তে তিন বছর মেয়াদী সুপরিকল্পিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে এক বছরের ব্যয়ভার কমে যাবে যা পরিমাণে প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিক্ষার পূর্ণব্যবহার হবে বলেও আমরা মনে করি। উপরন্তু উচ্চশিক্ষা আর ব্যক্তিবিশেষের সংরক্ষিত মৃগয়াভূমি থাকবে না, তা হবে গণমুখী, উচ্চশিক্ষা কেবলমাত্র urban elite সৃষ্টি করবে না, বরং তা সমাজ কল্যাণে উদ্যোগী এক সুসংহত ও সুশিক্ষিত জনশক্তি গঠনে সহায়ক হবে। প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও দেশের বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে বৈষম্য যত শীঘ্র কমবে দেশের জন্য ততই মঙ্গল। আমরা সেই মঙ্গলময় দিনের অপেক্ষাই করছি প্রতিদিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন-জট ও তার প্রতিকার*

সন্ত্রাস এবং সেশন-জট এখন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সব থেকে বড় সমস্যা। এ দু'য়ের মধ্যে অবশ্য যোগাযোগ-ও খুব নিবিড়। আজকের আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধকার হিসাবে সেশন জট সম্পর্কে আমার সব চিন্তা একত্রে গ্রথিত করে যদি উপস্থাপন করতে পারতাম তাহলে আমি খুবই খুশী হতাম। কিন্তু আমার কাজের ভীড়ে তা' সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশ্য এ বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনার প্রধান সূত্রগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং আশা করব যে আলোচনার মাধ্যমে আরো অনেক কথা বেরিয়ে আসবে এবং আমার ধারণা-গুলোকে আরো স্বচ্ছ করবে হয়তো বা। এবার সরাসরি মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।

সেশন-জটের কারণ:

সেশন জটের প্রথম এবং প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনির্ধারিত বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বই-এ বছরের একটা সংজ্ঞা আছে। কিন্তু এ সংজ্ঞা বহুদিন আগেই তার তাৎপর্য হারিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভর্তি, ক্লাশ আরম্ভের তারিখ, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ বা ফল প্রকাশের তারিখ সম্বলিত আমাদের কোনো বর্ষপঞ্জী নেই। তার কারণ অনির্ধারিত বন্ধের জন্য আমরা ১লা জুলাই বর্ষ আরম্ভ করতেও পারছি না এবং নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনও করতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আজকে এই যে, প্রায় সারা বছরই কোনো-না-কোনো নতুন ক্লাশ আরম্ভ হচ্ছে। আর গত ২০ বছরের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ফল হিসাবে এখন সেশনগুলি অন্তত বছর তিনেক পিছিয়ে গেছে। কেবল যে পিছিয়ে আছে তাই নয় কোনো কোনো ক্লাশ একাধিকও রয়েছে। নিম্নের বিবরণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত ও অনির্ধারিত বন্ধের একটা চিত্র পাওয়া যাবে। গত চার-পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ক্লাশসমূহ বন্ধের বিবরণী নিম্নরূপ :

১৯৮৭-৮৮ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ১০৪ দিন মোট ২২২

---

* প্রবন্ধটি প্রথমে একটি সেমিনারে পঠিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৯২-এর ত্রৈমাসিক সুন্দরম পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দিন, ১৯৮৮-৮৯ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৩৩ দিনসহ মোট ১৫১ দিন, ১৯৮৯-৯০ সালে নির্ধারিত ১২৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৫৮ দিন মোট ১৮৬ দিন, ১৯৯০-৯১ সালে নির্ধারিত ১১৪ দিনসহ অনির্ধারিত ৫১ দিন মোট ১৬৫ দিন, ১৯৯১-৯২ সালে নির্ধারিত ৫০ দিনসহ অনির্ধারিত ৯০ দিন মোট ১৪০ দিন। (৩১-১২-১৯৯১পর্যন্ত)।

অনির্ধারিত বন্ধের কারণ আবার অনেক। সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ধ ঘোষণা, সরকার কর্তৃক বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষকদের ধর্মঘট, ছাত্রদের ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলসমূহের ধর্মঘট ইত্যাদি। সেশন জট প্রধানত এসব কারণেই হয়েছে।

সেশন-জটের দ্বিতীয় কারণ ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব। সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তি করা হচ্ছে। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি যেহেতু সমন্বিতভাবে হচ্ছে না তাই ভর্তি-কার্য সমাধা করতে যথেস্ট সময় ব্যয় হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ৬/৭ মাস লেগে যাচ্ছে।

বিষয়টি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলি। বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে এবারে ভর্তির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় ২৭শে জানুয়ারি। এরপরে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ, সেগুলি নিরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ, সবকিছু সম্পন্ন করে ৬-১২-৯১ তারিখে, অর্থাৎ এক বছর পরে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখন যারা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তারা ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রী, অর্থাৎ তাদের ক্লাশ আরম্ভ হওয়ার কথা ১লা জুলাই, ১৯৯০ সালে। অর্থাৎ আমরা প্রথমেই দেড় বছর পিছিয়ে গেলাম। লক্ষণীয় যে, এ দুই অনুষদে ছাত্রছাত্রীদের অন্তত চার দফায় সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান করার পরেও এখনো বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষধে শতাধিক আসন খালি রয়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার পরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরো কোনো কোনো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। যার ফলে এখান থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী পরবর্তী সময়ে ঐসব শিক্ষায়তনে চলে গেছে।

সেশন-জটের তৃতীয় কারণ হচ্ছে সময়মত পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ হওয়ার জন্যই যে সময়মত ক্লাশ শেষ হচ্ছে না তা-ই নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, প্রায় প্রতিটি বিভাগে ২/১ জন শিক্ষক থাকেন যাদের ক্লাশ পেনিলোপের সূতার মতো, যার শেষ নেই। এর ফলে

পাঠ্যক্রম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্বভাবতই পরীক্ষার তারিখও আগে থেকে ঠিক-মতো নির্ধারণ করা যায় না। আর পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবি ওঠে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম প্রধানত বিভাগভিত্তিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বিভাগীয় পর্যায়ে হয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে, না হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভাগীয় চেয়ারম্যান মহোদয়গণ তাঁদের উপর শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের যে দায়িত্ব আছে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন না বলেই এ রকম ঘটছে।

ছাত্রদের পরীক্ষা পিছানোর দাবি সেশন-জটের আরেকটি কারণ। গত দুই দশকে আমার এমন কোনো ঘটনাই মনে পড়ছে না যেখানে পরীক্ষার তারিখ আমরা ঘোষণা করার পরে ঐ তারিখ ঠিক রাখতে পেরেছি। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হও-য়ার পরে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা পিছনোর দাবি উঠবেই এবং চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত তা' মানতেও হয়। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাহত হয়।

সেশন-জটের আরেকটি কারণ পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয়। আজকাল একটি রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে যে, দু'টি পরীক্ষার মাঝে ৪/৫ দিন করে বিরতি দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য নিজস্ব কারণেই এ বিরতি দিতে হয়। কেননা, আমাদের এমন পরীক্ষা কক্ষ নেই যেখানে একই দিনে সকল ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব, অর্থাৎ ৩/৪টি ব্যাচ করতেই হয়। আর তার ফলে কমপক্ষে ৩/৪ দিন বিরতি থাকেই। এছাড়া রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য ছুটির দিন ইত্যাদি। এসব নিয়ে দু'টি পরীক্ষার মাঝে যেহেতু ব্যবধান বেড়ে যায় তাই পরীক্ষা নিতেও দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যায়।

এরপরে ফল প্রকাশের কথা। আমাদের যে পরীক্ষা পদ্ধতি, এতে প্রতিটি খাতা দুইজন পরীক্ষক দেখেন। আবার দুই পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে ২০% ভাগের বেশি ব্যবধান হলে তৃতীয় আরেক জন পরীক্ষক নিয়োগ করতে হয়। দুই-জন পরীক্ষকের মধ্যে যেহেতু একজন বহিরাগত তাই খাতা-পত্র আনা-নেয়া ইত্যাদিতে কিছু সময় ব্যয় হয়। এই জটিল পদ্ধতির জন্য পরীক্ষার ফল প্রকাশে সবসময়ই দেরী হয়ে যায়। এ ছাড়া রয়েছে কোনো কোনো পরীক্ষকের সময়মত পরীক্ষার খাতা না দেখার বাতিক। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ সময় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বছরও) চলে যায় তা' সেশন জটের একটি কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাত্রছাত্রীরা যখন পরীক্ষা পেছানোর দাবি নিয়ে আসে তখন দু'টো প্রধান যুক্তি দেখায়। এক, পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়া এবং দুই, পরীক্ষার ফল প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব।

আমাদের নিয়ম-কানুনের জটিলতাও কিন্তু সেশন-জটের বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে একটি মোটা উদাহরণ দিচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার এবং বার্ষিক দুই পদ্ধতিই চালু আছে, আবার একই অনুষদে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা এবং প্রমোশন পদ্ধতিও আলাদা আছে। আরো দুঃখের বিষয় ছাত্রছাত্রীদের এসব নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রায় সময়েই স্পষ্ট ধারণা থাকে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদের আবেদন-নিবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমাদের অনেক সময় চলে যায়। আর তাই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর আসে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন, অর্থাৎ জটটা আরো বাড়ে।

প্রতিকারের উপায় :

এবারে সেশন-জটের কবল থেকে কিভাবে উত্তরণ সম্ভব তা' আলোচনা করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভর্তি প্রক্রিয়া, শিক্ষাদান কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ সব পর্যায়েই অস্বাভাবিক সময় লেগে যাচ্ছে। আমরা যদি সেশন-জট সত্যি সত্যি কমাতে চাই তাহলে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপ্তিকাল কমিয়ে আনতে হবে এবং যেহেতু সমস্যাটি ব্যতিক্রমধর্মী তাই কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিও আমাদের গ্রহণ করতে হতে পারে। আমরা উল্লেখ করেছি যে, এখন আমাদের সেশন আরম্ভ করতেই দেরী হয়ে যাচ্ছে এবং তা' ক্ষেত্র-বিশেষে এক থেকে দেড় বছর। এর কারণ হিসাবে আমাদের ভর্তি পরীক্ষার জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আর একটি কারণ উল্লেখ করা হয় নি, তা হচ্ছে এই যে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল এখন বের হচ্ছে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে যা আগে পূর্ববর্তী জুন মাসের মধ্যে বের হতো। অর্থাৎ বোর্ডের ফল প্রকাশে বিলম্ব ও পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া, এ দুই-এ মিলে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে এক/দেড় বছর পর। অতএব সেশন-জট নিরসন করতে হলে প্রথমত বোর্ডগুলিকে আগের মতো জুন মাসের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

এরপর আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং বি.আই. টি. গুলোর ভর্তি পরীক্ষা একই সাথে গ্রহণ করে সমন্বিত মেধা তালিকা প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছেমত কে কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় তা নির্ধারণ করে দেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা আমি অবশ্য বলছি কেবলমাত্র বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান অনুষধদদ্বয়ের জন্য। আমরা দেখেছি এবং ইতিপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, আগে পরীক্ষা নিয়ে ও ভর্তি করে ছাত্রছাত্রীদের

আমরা রাখতে পারছি না। কারণ পরবর্তী সময়ে অনেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ অথবা বি.আই. টি-তে চলে যায়। এজন্য এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। প্রশ্ন আসবে এই সমন্বয়সাধন কে করবে? এটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন করতে পারে অথবা প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একসাথেও করতে পারে কিংবা কেন্দ্রীয় কোনো সংস্থার মাধ্যমেও তা হতে পারে। আমরা এই সমন্বয়সাধন করতে পারলে দু'মাসের মধ্যে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পণ্ন করতে পারব, অর্থাৎ যে শিক্ষা বছরের ছাত্রছাত্রী সেই বছরে সেপ্টেম্বরে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাশ আরম্ভ করতে পারবে-এভাবে প্রথমেই এক বছর সময় বেঁচে যাবে।

এবার আসি পাঠদানের সময়সীমার কথায়। আমি মনে করি কোনো কোর্সই সম্পন্ন করতে ৫০টির বেশি বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ আমাদের যদি ২০ সপ্তাহের ক্লাশ হয় এবং প্রতি সপ্তাহে একটি কোর্সের জন্য তিনটি করে ক্লাশ নেয়া হয় তাহলে যে-কোনো কোর্স শেষ করা সম্ভব। গত এক বছর ধরে আমি এ কথাটি বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ ধারণাটি গ্রহণ করাতে পারছি না। আমি জানি না কেন? কারণ আমিও তো তিন দশক করে শিক্ষকতা করেছি এবং ২০ সপ্তাহে কেন নিয়মিত ক্লাশ নিলে একটি কোর্স সমাধা হবে না আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, আমার মনে হয় কারণটি অন্যখানে। অবশ্য আমরা যদি ক্লাশ না নেই তাহলে ২০ সপ্তাহ কেন, কোনোদিনই তা শেষ করা সম্ভব হবে না। যাক সে কথা, আমি যা বলতে চাচ্ছি তা' হচ্ছে এই যে, আমাদের বছরের ধারণাটি বদলাতে হবে। এ কথা বোঝা উচিত যে, ১২ মাসে যে বছর হয় সে বছর পঞ্জিকার বছর। কিন্তু ১২ মাসের বছর কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও আছে? ১২ মাসের মধ্যে ৩ মাস গ্রীষ্মাবকাশ ও আরো এক মাস বিভিন্ন ছুটি থাকে। অর্থাৎ আসলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কার্যকাল হচ্ছে ৮ মাস। এই ৮ মাসের মধ্যে ছাত্র ভর্তি করতে হবে, তাদের পড়াশুনা সম্পন্ন করতে হবে, পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় দিতে হবে, পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে পাঠদানের সময় ২০ সপ্তাহের বেশি পাওয়া কি যাবে কখনও? আমার এটাই প্রশ্ন। অথচ কিছুতেই এ বিষয়টি গ্রহণ করাতে পারছি না।

এরপরে আসি পরীক্ষা পদ্ধতির কথা। এখানে আমি আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন আপনাদের সামনে শুধুই বিবেচনার জন্য পেশ করব। আমরা এখন যে সেশন-জটের চোরাবালিতে আটকা পড়ে গেছি তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোর্স সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে আমরা ৪/৫ মাস সময় বাঁচাতে পারি। আমি জানি আমার এ কথা বলার সাথে সাথে একটি রৈ রৈ আওয়াজ উঠবে এবং বলা

হবে যে, 'এবার' সব গেল'। আমি কোর্স সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে অবশ্য এর বদলে যা সুপারিশ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে, ছাত্রছাত্রীদের কোর্স চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটা সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন হতে পারে, যে মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষার ফল নির্ধারিত হতে পারে। এ মূল্যায়নের অনেকগুলো উপাদান থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক-আমরা বলতে পারি যে, ক্লাশে ৭৫% ভাগ হাজিরা, প্রতিটি কোর্সের জন্য অন্তত দুইটি পাঠ্য বই পড়ে তা পর্যালোচনা করা, দুইটি টিউটোরিয়াল করা এবং কোর্স শেষে আধ ঘন্টাব্যাপী মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। এ সবগুলির সমন্বয়ে যদি পরীক্ষার ফল নির্ণীত হয় তাহলে কি আমরা সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব না? অবশ্য কোর্স সমাপনী লিখিত পরীক্ষা যদি বাদ দিতে হয় তাহলে আমি যে ব্যবস্থার কথা বললাম সেই উপাদানগুলি ছাড়া অন্যান্য কি কি উপাদান এবং কোনটির মূল্য কতভাগ হতে পারে তা সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। আমি এ ব্যবস্থা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জন্য বলছি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জন্য আমরা স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই কোর্স সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় এবং স্বভাবতই তৃতীয় পরীক্ষক পদ্ধতি বাদ দেয়া যেতে পারে। স্নাতকোত্তর (শেষ পর্ব) পরীক্ষায় আমরা আমাদের চিরাচরিত প্রথাটি রেখে দিতে পারি।

এ কথাটা আমি বলছি এ জন্য যে, বহুদিন ধরে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা হঠাৎ করে পরিবর্তন করলে পরীক্ষার গুণাগুণ সম্পর্কে বাইরের জগতের মানুষের আস্থা কমে যেতে পারে। যা হোক, যদি কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোর্স চলাকালীন মূল্যায়নে যাই তাহলে এক বছরে দু'বছরের পড়াশোনা শেষ করা যাবে। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করে দেখতে পারি তা সফল হচ্ছে কিনা? যদি সফল হয় তাহলে তা বরাবরের জন্য চালু হতে পারে। আর আমাদের মনে যদি সন্দেহ হয় এ পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না তাহলে অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অর্থাৎ সেশন-জট দূর করা পর্যন্ত সময়ের জন্য এটি রেখে আমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারি।

আমাদের পাঠ্যসূচি এবং ক্লাশ লোডগুলি একবার পর্যালোচনা করা দরকার। আমি বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসাবে লক্ষ করেছি যে, এক ইউনিট প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন সময় ব্যয় করা হচ্ছে। কোনো কোনো বিভাগে এর জন্য সপ্তাহে তিন ঘন্টা ব্যয় করছে, কোনো কোনো বিভাগ এর থেকে অন্তত চারগুণ ব্যয় করেছে। রসায়ন বিভাগেই প্র্যাকটিক্যাল কোর্স সবচেয়ে বেশি বলে আমার মনে হয়েছে। এ বিষয়গুলি একটু পর্যালোচনা করা দরকার। আসলে আমরা যখন পাঠদান করছি তখন এগুলোও চিন্তায় রাখতে হবে যে, ছাত্রদের লেখাপড়া করার সময় কতটুকু থাকছে?

পরীক্ষা ও প্রমোশনের নিয়মাবলী সম্পর্কে আমার কিছু সুপারিশ আছে। সম্মান ও সাবসিডিয়ারি মিলে যে সব কোর্স আছে তা' একজন ছাত্র যখন যেটার পরীক্ষা দিতে পারবে তা' যদি দেয় তাহলে কি কোনো ক্ষতি হবে? একটি অসুবিধা এই হতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বেশিদিন অবস্থান করার কারো কারো প্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু এরূপ যাতে না হয় সেজন্য তিন বছর অবস্থানের পর একজন ছাত্রের হলের আসন বাতিল করা যেতে পারে এবং তার মাইনে ও পরীক্ষার ফিস বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা একটি পরিবর্তন আনতে পারি একই পরীক্ষা বছরে দু'বার গ্রহণের ব্যবস্থা করে—তাতে পরীক্ষা পেছানোর প্রবণতা কমবে।

বছরের প্রথমেই সাংবাৎসরিক কার্যক্রমের বর্ষপঞ্জী তৈরি করে সকল ছাত্রছাত্রীকে তা' বছরের প্রারম্ভেই জানিয়ে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি, যাতে তারা আগে থেকেই জানতে পারে তাদের পরীক্ষার তারিখসহ অন্যান্য বিষয়, এবং সেভাবে যাতে তারা পূর্বাহ্নেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। এ বর্ষপঞ্জীর ভিত্তি হতে পারে ২০ সপ্তাহ কালব্যাপী ক্লাশ, ৪/৬ সপ্তাহ পরীক্ষার (যেখানে প্রযোজ্য) প্রস্তুতির সময়, ৪/৬ সপ্তাহ-ব্যাপী পরীক্ষা গ্রহণ, ৬/৮ সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশ।

উপসংহারে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে যদি আমাদের আন্তরিকতা না থাকে, যদি ছাত্রছাত্রীদের Motivation না থাকে, আর যদি অনির্ধারিত বন্ধে ছেদ না পড়ে। অনির্ধারিত বন্ধই সেশন-জটের প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রতিকারের বিষয় বলতে গিয়ে এ কথা আর আনি নি ইচ্ছাকৃতভাবেই। কারণ আমি মনে করি তা' প্রধানত যে কারণে হয় তা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সন্ত্রাস যেহেতু বহিরারোপিত তাই তা' আমদের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত। সন্ত্রাস যারা করেন বা করান তারা যদি এ বিষয়ে এগিয়ে না আসেন তাহলে সম্প্রতি একজন প্রবন্ধকার যেমন লিখেছেন আমাদের সমবেতভাবে একটি 'প্রার্থনা সভা' করা ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে!

ভাষা নিয়ে কথা*

এদেশে ভাষা নিয়ে যত কথা, যত আলোচনা শুনি তা বুঝি খুব কম দেশেই শোনা যায়। মাতৃভাষার দাবিতে এখানে অকুতোভয় কয়েকজন তরুণ প্রাণ দিয়েছে, সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলাভাষা এমন কথা রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু তার পরেও ভাষা নিয়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হচ্ছে সবসময়। বস্তুত ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে যে মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হয় তা মানুষের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। ঐতিহাসিকদের মতে, ঐদিন মাতৃভাষার জন্য প্রাণদানের মাধ্যমে এদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্বভাবতই সাতচল্লিশ বছর আগে আজকের এইদিনে ঘটে-যাওয়া ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে একক কোনো ঘটনা অনুরূপভাবে তা পারেনি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, আজও পণ্ডিতজনদের মুখে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার দাবি ওঠে। এ থেকে কতগুলো প্রশ্ন চলে আসে। যেমন, আমরা স্বাধীনতালাভের ২৭ বছর পরেও একটা গ্রহণযোগ্য ভাষানীতি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি কেন? শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার অবস্থান কি? অন্যান্য ভাষারই বা স্থান কোথায়? বিভিন্ন ভাষা আমাদের জাতীয় জীবনে কি ভূমিকা পালন করছে বা করা উচিত। এ বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত যে কথাটি প্রায়শই উচ্চারিত হয় তা এই যে, আমাদের কি কোনো ভাষানীতি আছে? শুনতে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হলেও উত্তর হবে একই সাথে 'হ্যাঁ' এবং 'না'। 'হ্যাঁ' এ কারণে যে, বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের মাধ্যমে বাংলাভাষা চালু করার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশনও সুপারিশ করেছে। আর 'না' এ কারণে যে, এসব আদেশ-নির্দেশ-সুপারিশ কেবলমাত্র ভাষার ব্যবহারের জন্য গঠিত কোনো কমিটি-কমিশনের বরাতে আসেনি। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

---

* ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-এ দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বাধীনতা লাভের পরে কয়েক বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে সরকার থেকে সরকারি কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশনামা আসত। এ নির্দেশনামা কিন্তু প্রচারিত হতো ইংরেজি ভাষায় যা নিয়ে কিছুটা কৌতুকের সৃষ্টি হতো। সে যাই হোক, ১৯৭২-এর নভেম্বর মাসে দেশের যে সংবিধান প্রণীত হয় সেখানে প্রজাতন্ত্রের ভাষা হবে বাংলা—এরূপ কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তারপরেও প্রশাসনে এবং অন্যত্র বাংলাভাষার ব্যবহার খুব প্রসার লাভ করেনি। সে সময়ে কতগুলো অবকাঠামোগত অসুবিধা ছিল। যেমন, টাইপরাইটারের অভাব, বিশেষ বিশেষ শব্দের সাথে প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচিতির ঘাটতি এবং সর্বোপরি ভুল করার ভীতি। এ সবের সাথে যুক্ত ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতির অভাব। এ সবের সামগ্রিক ফল এই হলো যে, যে যার মতো চলতে থাকল। এ অবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষতি হতে থাকল যথেষ্ট। এ অবস্থা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত চলে। ঐ সময়ে যে সরকার দেশে আসে তারা ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির প্রধান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সদস্য ছিলেন ঐ বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত নাট্যকার মমতাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ আলাউদ্দীন আল আজাদ এবং ডঃ আলমুতী শরফুদ্দীন। শেষোক্ত দু'জন তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। এ কমিটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বস্তরে বাংলা চালু করার প্রস্তাব করে। ১৯৮৬ সালে নির্বাচনের ফলে যে সংসদ গঠিত হয় সেই সংসদের প্রথম অধিবেশনে উল্লিখিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সকল দফতরে ও প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। অবশ্য ১৯৭২ সাল থেকেই সময় যত অতিবাহিত হয়েছে ততই বাংলার ব্যবহার অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ব্যাপ্তিলাভ করেছে। খুব সম্ভবত বিচার বিভাগের উচ্চ-আদালত ব্যতীত প্রায় সমস্ত অফিস-আদালতে এখন বাংলাভাষায় কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশাসনিক কাজে যদিও প্রকাশ্যভাবে বাংলাভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা কেউ করেননি কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা এবং একই সাথে অন্যান্য ভাষার অবস্থান কি হবে এ নিয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এর সঙ্গে যে সব প্রশ্ন জড়িত সেগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, শিক্ষার সর্বপর্যায়ে কেবল কি বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হবে? আমাদের

ছাত্রছাত্রীরা কি অন্য ভাষা শিখবে নাকি শিখবে না? যদি শিখে তাহলে কোন ভাষা শিখবে এবং সে সবের মান কি হবে? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের সংবিধানে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তবুও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একই পদ্ধতির বা গণমুখী বা সর্বজনীন রূপ এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। শিক্ষার মাধ্যমের ক্ষেত্রে এটি আরো প্রকটভাবে দৃশ্যমান। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে কেবল মাতৃভাষা বাংলা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে না উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও। এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ব্যবহারের ব্যাপারে অসমতা আছে, আবার ছাত্রছাত্রীরাও সকলে উত্তর লেখার জন্য কেবল মাতৃভাষা ব্যবহার করছে না। তবে এ ব্যাপারে যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অভাব আছে তা নয়। অবশ্য অন্য একটা বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তহীনতা রয়েছে। বিষয়টি দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষাটি কি হবে? ইংরেজি না অন্য কোনো ভাষা? কোন পর্যায়ে আমরা এ ভাষার শিক্ষাদান আরম্ভ করব? বিগত দিনের বিভিন্ন সময়ের সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থানের প্রায়ই পরিবর্তন হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭২ সালে যে খুদা কমিশন গঠিত হয় সে কমিশন সুপারিশ করে যে, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শেখানো আরম্ভ করা হোক। ১৯৭৬ সালে যে কারিকুলাম কমিটি গঠিত হয় সে কমিটি তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের কথা বলে। ১৯৮২ সালে নতুন সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে বাংলার সাথে ইংরেজি এবং দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে সরকারের এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ১৯৯২ সালে পুনরায় প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান সরকারের আমলে যে শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে তা তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে।

উপরের বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সব সরকারের আমলেই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মতপার্থক্য দেখা গেছে কোন পর্যায়ে তা আরম্ভ করা হবে এ নিয়ে। বারবার এভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ায় কোনো সিদ্ধান্তই চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়নি এবং এ কারণে ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞান অর্জনে সুফল পাওয়া যায়নি। বাস্তবিকপক্ষে যদি শিক্ষার মানের অবনতির জন্য একটি মাত্র কারণ নির্দেশ করতে বলা হয়, তাহলে আমার ধারণা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বেশিরভাগ ব্যক্তি যথোপযুক্ত ভাষাজ্ঞানের অভাবের

কথা উল্লেখ করবেন। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা এই যে, আজকের ছাত্রছাত্রীদের বৃহদাংশ মাতৃভাষাসহ অন্য কোনো ভাষাতেই সঠিকভাবে লিখতে বা পড়তে সক্ষম নয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের প্রদত্ত বক্তৃতাও তাদের বেশিরভাগ বুঝে উঠতে পারে না। এর ফলে নিঃসন্দেহে শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে।

কেউ কেউ শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপর্যায়ে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের বাধা হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল প্রধানত বাংলা একাডেমীর। খুব সম্ভবত আর্থিক অসামর্থ্য বা প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা বা অন্য কোনো কারণে একাডেমী সব সময়ে তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারনি। তবুও পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অনেক বইপুস্তক একাডেমী প্রকাশ করেছে। লক্ষণীয় যে, সংখ্যার বিচারে ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ এই সময়ে একাডেমী প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা বছরওয়ারি হিসাবে সর্বাধিক। প্রথম দু'বছরে মোট ৪৫১ খানি বই একাডেমী প্রকাশ করেছে (অর্থাৎ প্রতিবছর ২২৫ খানি)। দ্বিতীয় সময়কালে চার বছরে এ সংখ্যা ছিল ৭৮৫ খানি (অর্থাৎ বছরপ্রতি প্রায় ২০০ খানি)। এ ছাড়া বেসরকারি পুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্টসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক বাজারে ছেড়েছেন। বর্তমান অবস্থা এই যে, প্রায় সব বিষয়ের এবং পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় পাওয়া যাচ্ছে, যদিও বিজ্ঞানবিষয়ক বই-এর ক্ষেত্রে তা কিছুটা পিছিয়ে বিশেষ করে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য আর একটি বিষয়েও বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি হচ্ছে পরিভাষা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আসে বাংলা মাধ্যম বিদ্যায়তন থেকে। এরা নিম্নপর্যায়ে বাংলা পরিভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়াবলী অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এদের আন্তর্জাতিক পরিভাষার সাথে নতুন করে পরিচয় ঘটে যা প্রচণ্ড মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যার সৃষ্টি করে। শহরাঞ্চল থেকে আগত বিদ্যার্থীরা সেই বাধা যত সহজে ও কম সময়ে অতিক্রম করতে পারে, সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের তা সহজ হয় না। কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায় তা এখনও একটা চ্যালেঞ্জ।

ভাষা বিষয়ে উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কতগুলো মন্তব্য করব।

(১) সর্বপর্যায়ে কোনোরূপ ব্যত্যয় ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা চালু করতে হবে একথা বারবার বলা প্রয়োজন, তা না হলে অনেকে মনে করতে পারেন যে, আমরা বুঝি কোনো সময়ে তা পরিবর্তন করতে পারি।

(২) বাংলা একাডেমী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সহযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের,

বিশেষ করে বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজে হাত দিতে পারে। যেসব বই বাজারে চালু আছে সেগুলোর পরিমার্জিত সংস্করণও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

(৩) বাংলা একাডেমী ইতিপূর্বে পরিভাষাসংক্রান্ত যেসব পুস্তিকা প্রকাশ করেছে সেগুলোর পরিমার্জন ও প্রমিতকরণও প্রয়োজন।

(৪) ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকার করে কোন শ্রেণী থেকে তা প্রচলন করা হবে এ সম্পর্কে একটি স্থির ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা যাতে গৃহীত হয় সে বিষয়ে আশু পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্য সৃষ্টি করা না হলে যখনই কোনো নতুন সরকার আসবে তখনই তা পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দেবে, যার ফল কোনো সময় শুভ হবে না।

(৫) সরকারি কাজে বিচারালয়সহ সর্বত্র বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি কার্যাবলীর স্বচ্ছতার জন্য তা প্রয়োজন।

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাকৃতিক সম্পদহীন এই দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতমান নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমেই টিকে থাকতে পারে। আর এর প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত ভাষার বুৎপত্তি, কারণ ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা : কিছু কথা*

সুধীবৃন্দ,

গত ১লা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র দশদিন আগে যখন আমাকে প্রয়াত ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তখন আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম, কয়েকটি কারণে। প্রথমত, আমরা এমন একটি সমাজে বাস করছি যেখানে সত্যিকারে কোনোরূপ মানসিক বাধা ছাড়াই একজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতে পারা যায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম। ডাঃ ইব্রাহীম ছিলেন এর ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, আমি আজ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, যে প্রতিষ্ঠানটি এখান থেকে সেবাপ্রাপ্ত সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, এদেশে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে এলে বোঝা যায় না যে এখানকার ব্যবস্থাপনা কি এদেশের লোক দ্বারা পরিচালিত, না পশ্চিমের কোনো উন্নত দেশের লোক এখানকার পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন। চতুর্থ আরেকটি কারণ ছিল তা হচ্ছে এই যে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিটির প্রথম স্মারক বক্তৃতা দেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর তাই যদিও আমার দৈনন্দিন জীবন অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটে এবং যদিও আমি জানতাম যে একটি স্মারক বক্তৃতা লেখার জন্য যতটুকু সময় তথ্যাদি সংগ্রহে বা গবেষণায় দিতে হবে তা আমার নেই, তবুও আমি রাজি হয়েছিলাম কেবলমাত্র জনসমক্ষে এই ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার বিবেককে পরিষ্কার রাখতে।

ডাঃ ইব্রাহীমের সাথে আমার যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল এমন নয়, তবে আমরা একে অপরকে জানতাম। তাঁর সাথে একদিনের আলাপের কথা আমার এখনও মনে পড়ছে, যা যখনই আমার মনে হয়, তখনই আমাদের কর্মকুশলতা বা কর্মদক্ষতা অন্য কোনো জাতির তুলনায় যে কম নয় তা ভেবে আশ্বস্ত হই। আমি যখন একদিন

---

* ডাঃ এম ইব্রাহীমের স্মরণে প্রদত্ত বক্তৃতা (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০)।

বারডেম-এর ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ইত্যাদির কথা তাঁর কাছে বলছিলাম যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি কি জানেন যে এই প্রতিষ্ঠানটি যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা সবাই এদেশের লোক এবং এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য আমি কোনো বিদেশী অর্থ নিইনি। এর ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত তাঁরা সবাই এদেশের। যদি সততা থাকে, আন্তরিকতা থাকে এবং দেশপ্রেম থাকে, তাহলে আরও অনেকে এরূপ কাজ করতে পারেন। আমি যখন এই বীরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাচ্ছি, তখন অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠে বলতে আমি প্রস্তুত যে প্রয়াত ডাঃ ইব্রাহীমের কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি।

আমি আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই, এ কারণে যে তাঁরা ডাঃ ইব্রাহীমের পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য এই বক্তৃতামালার আয়োজন করেছেন। তাঁরা এই বক্তৃতামালায় আমাকে অংশগ্রহণের যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য জানাই আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

ডাঃ ইব্রাহীম, আপনারা জানেন, তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে। মন্বন্তরের বাংলা, গ্রামবাংলা এবং এদেশের জনগণের দুর্দশা এবং দারিদ্র তিনি কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর মনে নিজের পেশাদারী অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার পরিধিতে কিছু করার ব্যগ্রতা তাঁর জন্মেছিল। সেই ব্যগ্রতা এবং কর্মোপলব্ধির ফসল আজকের বারডেম যা সাধারণভাবে ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন নামে পরিচিত। এটি একটি প্রতিষ্ঠান তো বটেই তবে একই সঙ্গে একটি সামাজিক আন্দোলন।

ডাঃ ইব্রাহীমের স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই স্মারক বক্তৃতার জন্য আমি যে বিষয়টি বেছে নিয়েছি তা হলো "বাংলাদেশের দারিদ্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা : কিছু কথা।"

আমাদের দেশ দরিদ্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোরও একটি। বিশ্ব ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক হিসাবমতে আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৮৮ সালে ছিল ১৭০ ডলার এবং আমাদের চাইতে কম মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র চারটি দেশের—চারটিই আফ্রিকার ঃ মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, শাদ ও তানজানিয়া। তবে বাংলাদেশের আপেক্ষিক অবস্থান বুঝতে হলে আশেপাশের এশীয় দেশগুলির সঙ্গে তুলনা প্রয়োজন। সারণী-১ এ তা দেখানো হয়েছে।

সারণী-১ থেকে এটা স্পষ্ট যে সাধারণভাবে তেল উৎপাদক নয় এমন এশীয় দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান মাথাপিছু আয়ের বিচারে সর্বনিম্নে। যদি ঘরের কাছে দেখি তবে দেখব নেপাল ও ভুটান ছাড়া আর সব দক্ষিণ এশিয়ার দেশ যথা ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মাথাপিছু আয় আমাদের মোটামুটি দ্বিগুণ। যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি দেখি তবে আমাদের দৈন্য আরো প্রকটভাবে দেখা

দেয়। যে থাইল্যাণ্ড ষাটের দশকে আমাদের থেকে এমন কিছু পৃথক ছিল না আজ তার মাথাপিছু আয় আমাদের প্রায় ৬গুণ।

সারণী-১ থেকে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় কেবল সকলের চাইতে কম তাই নয়, তা বাড়ছেও সবচাইতে ধীর গতিতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বাদ দিলেও কেবল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও এই বৃদ্ধির হার আমাদের চাইতে অনেক উপরে। এর আর এক অর্থ এই যে ভবিষ্যতেও বেশ কিছু বছর, বিশেষ করে যদি বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা আমাদের দেশে তেমন সফল না হয়, তবে এই আপেক্ষিক বৈষম্য থেকে যাবে।

সারণী-১

এশীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ভিত্তিক অবস্থান

দেশ	জনসংখ্যা মিলিয়ন (মধ্য-১৯৮৮)	জাতীয় আয় মাথাপিছু ডলার (১৯৮৮)	জাতীয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বাৎসরিক হার (%)
বাংলাদেশ	১০৮.৯	১৭০	০.৪
ভুটান	১.৪	১৮০	..
নেপাল	১৮.০	১৮০	..
চীন	১০৮৮.৪	৩৩০	৫.৪
ভারত	৮১৫.৬	৩৪০	১.৮
পাকিস্তান	১০৬.৩	৩৫০	২.৫
শ্রীলংকা	১৬.৬	৪২০	৩.০
ইন্দোনেশিয়া	১৭৪.৮	৪৪০	৪.৩
ফিলিপাইন	৫৯.৯	৬৩০	১.৬
থাইল্যান্ড	৫৪.৫	১০০০	৪.০
মালয়েশিয়া	১৬.৯	১৯৪০	৪.০
দক্ষিণ কোরিয়া	৪২.০	৩৬০০	৬.৮
সিঙ্গাপুর	২.৬	৯০৭০	৭.২
হংকং	৫.৭	৯২২০	৬.৩

উৎস ঃ World Bank, World Development Report, 1990; Poverty, pp. 178-79

বাংলাদেশের এই দীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। এক, এই অবস্থা কি দেশে সকলেরই না তাতে তারতম্য আছে? দুই, দারিদ্র্য বলতে কি কেবল আয়ের দারিদ্র্যই বুঝব, না তার আরো অন্য রূপ আছে এবং তা কি সাধারণভাবে আয়-নির্ভর না আয়-অনপেক্ষ? বিশেষ করে মানব-সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে কি আয়-বৃদ্ধি এবং

দারিদ্র্য মোচনের কোনো সম্পর্ক আছে? তবে, এ বিষয়গুলোতে যাবার আগে আমি অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

আপনারা জানেন যে বেশ কিছুদিন যাবৎ বিশেষ করে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ক্লাব অফ রোমের Limits to Growth প্রতিবেদনের পর থেকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রতি সকলের নজর পড়েছে। যেহেতু শেষ বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদই অর্থনৈতিক অগ্রগতির উৎস তাই এর ব্যবহার এমন হতে হবে যাতে তার মাত্রা ভবিষ্যতে বজায় থাকে। অবশ্যই যে সব সম্পদ আসলেই সীমিত, যেমন গ্যাস, সেক্ষেত্রে তার ব্যবহার হতে হবে দীর্ঘমেয়াদী সুফলের ভিত্তিতে। এদিক থেকে বিচার করলে জাতীয় আয়ের (gross national product) থেকে জাতীয় বজায়যোগ্য আয় (gross sustainable product) বেশি অর্থবহ। এ সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মতো। হাঁসটা জিইয়ে রাখলে প্রতিদিন ডিমটা পাওয়া যাবে—কিন্তু যদি হাঁসটা মেরে ফেলি তাহলে আজকে হয়তো লাভ হলো, কারণ হাঁসের দাম ডিমের চাইতে বেশি, কিন্তু তার পরে তো আগামী কাল থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। হাঁসও না, ডিমও না।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। ১৯৭১-৮৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মোটামুটি বছরে ৭ শতাংশ। দেখা গেছে যে যদি তেল আহরণ, ভূমি ক্ষয় ও বন উজাড় ক্ষতি হিসাবে ধরা হয় তবে এই হার ৪ শতাংশে নেমে আসে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যে পরিবেশগত কুপ্রভাব পড়ছে এবং তার দরুণ আবার অর্থনীতিতে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা হিসাবে ধরতে হবে। সাধারণ পুঁজির অবচয়ের মতোই প্রাকৃতিক পুঁজির অবচয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

যদি এদিক দিয়ে বিচার করি তবে বাংলাদেশে সমস্যা হয়তো আরো তীব্র এবং তা আমাদের দীন অবস্থাকে দীনতর করবে। তবে, এ বিষয়টি এত ব্যাপক যে সে সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা আমাদের মূল বিষয় থেকে অনেক খানি সরে যাব—এই আশঙ্কায় আমি আর এ প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত করছি না।

আমরা প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলাম যে আমাদের এই দেশে কি সকলেই গরিব? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে, অনেকেই গরিব, তবে সবাই নয়। প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন আসে, কতজন গরিব? সময়ের সাথে কি তাদের সংখ্যা বা জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত বাড়ছে?

আমি যতদূর জানি এ সব হিসাব খুব পরিষ্কার নয়। বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হিসাব দিয়েছেন এবং তা নিয়ে তাঁদের মধ্যেই যথেষ্ট মতদ্বৈধতা রয়েছে। তবে দু-একটা বিষয়ে তাঁদের মতামত একই ধরনের।

এক, বাংলাদেশে দরিদ্র জনগণের অনুপাত মধ্য-সত্তর পর্যন্ত বাড়ছিল, তারপর থেকে কমতে শুরু করে। দুই, শহরের তুলনায় গ্রামে এই অনুপাত অনেক বেশি। শহরে মোটামুটি ৩০-৪০ শতাংশ লোককে গরিব বলা যায় অর্থাৎ একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্মদক্ষতার জন্য যে দৈনিক ২২০০ ক্যালরি শক্তির খাবার প্রয়োজন হয়, তা যোগাড় করার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। এই অনুপাতটা গ্রামে অনেক বেশি মোটামুটি ৫০ শতাংশ। তিন, দরিদ্র জনগণের অনুপাত আগের চাইতে কমে আসলেও এখনও দারিদ্র্য অতি ব্যাপক। দেশের মোট সাড়ে চার-পাঁচ কোটি লোক এর শিকার। সুতরাং, দারিদ্র্য আগের থেকে যদি কমেও থাকে, তাতে আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে দারিদ্র্য বলতে আমরা কি কেবল আয়ের দারিদ্র বুঝব। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা দারিদ্র বলতে যা বুঝি তা দূর করার জন্য কি আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। একথা অনস্বীকার্য যে আয় বৃদ্ধি দারিদ্র্য দূর করার একটা মস্ত বড় উপায়। আয় বাড়লে লোকে সাধারণভাবে বেশি খাবার ও পুষ্টি পাবে এটা ধরে নেয়া যায়। কিন্তু কেবল ভাত-কাপড়ের অভাবই তো একমাত্র অভাব নয়। এবং ভাত-কাপড় পেলে সকলেই (শিশু বা মহিলা) সমানভাবে পাবে তাও বলা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্ষুধা অবশ্যই দূর করতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে চাই এমন সমাজ যেখানে অন্তত স্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভের নিশ্চয়তা থাকবে। জাতি যদি সুস্থ ও শিক্ষিত না হয়, তবে উন্নয়নের অর্থ কি? এগুলোই তো উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ফসল। আবার যদি আর এক দিক থেকে দেখা যায়, জাতি যদি সুস্থ ও শিক্ষিত না হয়, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এবার দেখি আমাদের স্বাস্থ্যের চিত্রটা কি। এ সম্পর্কিত তুলনামূলক কিছু তথ্য সারণী-২ এ দেয়া হয়েছে। প্রথমেই আমরা দেখি যে বাংলাদেশে জন্মকালে কম ওজনের শিশুদের অনুপাত অন্যান্য দেশের থেকে বেশি। এশিয়াতেই অন্যান্য অনেক দেশের যেমন ফিলিপাইন বা ইন্দোনেশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ। শিশুমৃত্যুর হারেও আমরা সবার উপরে। অন্যদিকে বাচ্চাদের টিকাদানে আমাদের উৎসাহ সবচাইতে কম। চিকিৎসক ও নার্স দুয়ের সংখ্যাতেই আমরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে। এ সবের ফল জন্মকালে আমাদের জীবন প্রত্যাশা বা (Live expectancy at birth) এক ভুটান ছাড়া আর সকলের চাইতে কম। একটি উদাহরণই যথেষ্ট, শ্রীলঙ্কায় জন্মকালে জীবন-প্রত্যাশা ৭১ বছর, আমাদের মাত্র ৫২ বছর।

পাশাপাশি দেখি যে, আমাদের জাতীয় আয়ের যে অংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করি তা অন্য অনেকের চাইতে কম হলেও খুব কম নয়। অর্থাৎ ব্যয় যাতে করি তার

বিশেষ ফায়দা উঠে না। বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম লোক নিরাপদ পানি পান করতে পারে, শ্রীলঙ্কায় প্রায় ৯৩ শতাংশ, ভারতে প্রায় ৫৭ শতাংশ। অন্য সব দেশে চিকিৎসকের তুলনায় নার্স বেশি, আমাদের ঠিক উল্টা। অবশ্যই একজন চিকিৎসকের জন্য মোট ব্যয় একজন নার্সের জন্য ব্যয়ের চাইতে অনেক বেশি।

সারণী-২

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক চিত্র

দেশ	জন্মকালীন কমওজনের শিশু% ১৯৮৫	শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুতে ১৯৮৮	জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা ১৯৮৭	একবছর বয়স্কদের টিকাদান % ১৯৮৭	চিকিৎসক প্রতিজন সংখ্যা ১৯৮৪ (০০০)	নার্সপ্রতি জনসংখ্যা ১৯৮৪ (০০০)	জাতীয় আয়ে স্বাস্থ্য ব্যয়ের শতাংশ ১৯৮৬
বাংলাদেশ	৩১	১১৮	৫২	১৮	৬.৭	৯.০	০.৬
ভুটান	..	১২৭	৪৯		২৩.৩	৩.০	
নেপাল	..	১২৬	৫২	৭১	৩২.৭	৪.৭	০.৯
চীন	৬	৩১	৭০	৯৬	১.০	১.৭	১.৪
ভারত	৩০	৯৭	৫৯	৬৩	২.৫	১.৭	০.৯
পাকিস্তান	২৫	১০৭	৫৮	৬৫	২.৯	৪.৯	০.২
শ্রীলঙ্কা	২৮	২১	৭১	৭৯	৫.৫	১.৩	১.৩
ইন্দোনেশিয়া	১৪	৬৮	৫৭	৭১	৯.৫	১.৩	০.৭
ফিলিপাইন	১৮	৪৪	৬৪	৮২	৬.৭	২.৭	০.৭
থাইল্যান্ড	১২	৩০	৬৬	৭৯	৬.৩	০.৭	..
মালয়েশিয়া	৯	২৩	৭০	৭৪	১.৯	১.০	১.৮
দঃ কোরিয়া	৯	২৪	৭০	৮৯	১.২	০.৬	০.৩
উঃ কোরিয়া		২৪	৭০	৫৯	..	..	১.০
সিঙ্গাপুর	৭	৭	৭৩	..	১.৩	..	১.২
হংকং	৪	৭	৭৬	..	১.১	০.২	..
ভিয়েতনাম	১৮	৪৪	৬২	৫৮	১.০	০.৬	..

উৎস ঃ World Bank, World Development Report, 1990 pp. 232-233, UNDP, Human Development Report, 1930, pp. 146—1493 pp. 130—131.

বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে গ্রামে স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা শহরের তুলনায় প্রায় নেই বললেই চলে। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স ইত্যাদি নামে যা আছে তার কি অবস্থা? প্রথমেই বলে নিই যে এসব দালানকোঠা বানাতে হবেই। কিন্তু বানানোর পরে তার যদি ব্যবহার না করা যায় তবে এ ব্যয়ের কি কোনো অর্থ আছে? কোনো কোনো সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০ ভাগ সিনিয়র ডাক্তারের পদ শূন্য। অন্য যাঁরা আছেন, সিনিয়র ডাক্তারের অভাবে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারেন না।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত নিরাময়ধর্মী, নিরোধধর্মী নয়। কিছু কিছু নিরোধ-ধর্মী ব্যবস্থা যে নেই তা নয়; যেমন ইদানীং টিকাদানে কিছু অগ্রগতি হয়েছে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরো অনেক করার আছে।

আমি বলছি না যে নিরাময়-ধর্মী চিকিৎসা ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে, তা থাকবে কিন্তু রোগ যাতে না হয়, বিশেষত যে সব রোগের সহজেই প্রতিরোধ সম্ভব হয় সে ব্যাপারে আরো নজর দিতে হবে। এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এখানে আমি বর্তমান পাঁচশালা পরিকল্পনার একটি ত্রুটি উল্লেখ করতে চাই। এতে আগের 'পল্লী চিকিৎসক' পদ্ধতি একেবারে তুলে দেয়া হয়েছে। এটা একটা পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ বলে অন্তত আমার মনে হয়।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনার ইতি টানার আগে আমি আরেকটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখা গেছে যখন জন্ম হয় তারপর প্রায় এক বছর বাংলাদেশী ও ইউরোপীয় শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে বিশেষ তফাৎ থাকে না। কিন্তু মোটামুটি ১-২ বছর বয়সের মধ্যেই যথেষ্ট তফাৎ দেখা দিতে শুরু করে যেটা পরেও থেকে যায়। এর তাৎক্ষণিক কারণ অবশ্যই পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব। পুষ্টির অভাবের একটা কারণ অবশ্যই পর্যাপ্ত আয়ের অভাব। কিন্তু বিভিন্ন তথ্যে দেখা যায় যে, আয় পুষ্টির পূর্ণ নিয়ামক নয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা ও প্রদত্ত দ্রব্যের উপরও তা অনেকটা নির্ভরশীল এবং এই সেবাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সরকারি খাতে স্বাস্থ্য ও ঐ ধরনের সেবা। বেসরকারি খাতে যা তা হতে পারে না তা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো এ ধরনের সেবা সরকারনির্ভর হতে বাধ্য।

এবার আমি মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অঙ্গ শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি আগেই বলেছিলাম যে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে যে উনবিংশ শতাব্দীর সেই ধারণা যে শিক্ষা মানুষের মন গড়ে তোলে, তাকে মুক্ত ও উদার করে তা এখনো কিছুটা প্রযোজ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার (এখানে শিক্ষা বলতে আমি 'দক্ষতা' তৈরির যে-কোনো ট্রেনিং বুঝাচ্ছি) একটা ব্যবহারিক দিক আছে তা কোনোমতেই ভোলা চলে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু প্রায়োগিক দিক আছে যা না শিখলে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তারের উদাহরণ তো সহজবোধ্য। চাষী যদি শিক্ষিত না হয়, তার অক্ষরজ্ঞানটুকুও না থাকে, তবে আজকালকার আধুনিক চাষবাস সে করবে কেমন করে? কৃষি সম্প্রসারণ দফতরের কর্মী যখন তার সঙ্গে নতুন আলু বীজ, কি সরিষাতে কখন কতটুকু সার দিতে হবে আলোচনা করেন তখন তা বোঝা তার জন্য কষ্টকর হবে। এজন্য দেখা গেছে যে যেখানেই আধুনিক চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে সেখানে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা বেড়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা কি? প্রথমে অন্যদেশের সঙ্গে তুলনা করলে আবার সেই আগের মতোই, একটা দীন ছবি ফুটে ওঠে। পাকিস্তান আর ভুটান ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাংলাদেশে সবচাইতে কম, বিদ্যালয়ের ভর্তিযোগ্য জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ মাত্র। ভারতে তা ৯৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ১০৪ শতাংশ। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যাও অন্য সকলের চাইতেই কম। অথচ জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসাবে অন্য অনেকের চাইতে খুব একটা কম যে ব্যয় করি তা নয়—অর্থাৎ ব্যয়টা হয় উপরের দিকে। তবে যেহেতু আমাদের জাতীয় আয়টাই মাথাপিছু কম, মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় আমাদের যথেষ্ট কম। ফলে বয়স্ক শিক্ষার হারেও দারুণ বৈষম্য দেখা যায়। এক নেপাল আর পাকিস্তান ছাড়া সবাই আমাদের উপরে। শ্রীলঙ্কার হার তো আমাদের আড়াই গুণেরও বেশি।

সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার কি অবস্থা? আমরা যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার ভিতটাই ভালো করে গড়ছি না, সেজন্য পরের পাকা দালানটাও ভালো করে গড়ে তুলতে পারছি না। তাই ভারতে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় যেখানে বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানের সংখ্যা ৩.৩, চীনে ৭, মালয়েশিয়ায় ৬.৯ ও শ্রীলঙ্কায় ৪.৭, বাংলাদেশে তা মাত্র ১.১। অর্থাৎ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আমরা তেমন পারিনি।

আর কেমন করেই বা তা হবে। আজ থেকে ২০ বছর আগে পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে ছিল এখনও প্রকৃতপক্ষে তা-ই রয়ে গিয়েছে। অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে দেড়গুণ। কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণে এখানে ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে কতগুলো কলেজকে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মানোন্নয়নের কোনো আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন কলেজে স্নাতক সম্মান বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলো যেহেতু পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না, সেজন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এখানে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদে যে সব ছাত্রছাত্রী গত কয়েক বছরে ভর্তি হতে এসেছে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০। কিন্তু আমরা

ভর্তি করতে পারি মাত্র ১০০০ ছাত্রছাত্রী। বাকিরা কোথায় যায়, কি করে তা আমি কিছুই বলতে পারব না। সামগ্রিকভাবে এ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের একটি চিত্র।

এছাড়া শিক্ষার যা সুযোগ আমাদের আছে, তার অনেকটাই নগরভিত্তিক। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তো বটেই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

সারণী-৩

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান

দেশ	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির শতকরা হার ১৯৮৭	প্রাইমারী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১৯৮৬-৮৮	জাতীয় আয়ে শিক্ষাজনিত ব্যয়ের অনুপাত ১৯৮৬	বয়স্ক শিক্ষার হার (১৯৮৫)
বাংলাদেশ	৫৯	৫৯	২.২	৩৩
ভুটান	২৪	৩৭	..	..
নেপাল	৮২	৩৫	২.৮	২৬
চীন	১৩২	২৪	২.৭	৬৯
ভারত	৯৮	৪৬	৩.৪	৪৩
পাকিস্তান	৫২	৪১	২.২	৩০
শ্রীলংকা	১০৪	৩২	৩.৬	৮৭
ইন্দোনেশিয়া	১১৮	২৮	৩.৫	৭৪
ফিলিপাইন	১০৬	৩২	১.৭	৮৬
থাইল্যান্ড	৯৫	২০	৪.১	৯১
মালয়েশিয়া	১০২	২২	৭.৯	৭৪
দক্ষিণ কোরিয়া	১০১	..	৪.৯	
উত্তর কোরিয়া	..	৩৬	..	..
সিঙ্গাপুর	..	২৭	৫.২	৮৬
হংকং	১০৬	২৭	..	৮৮
ভিয়েতনাম	১০২	৩৪	..	..

উৎস ঃ World Bank, World Development Report, 1990 pp. 234-235, UNDP, Human Development Report, 1990, pp. pp. 130-131, 154-155.

দেখা গেছে যে, শহরে এ ধরনের স্কুলে যেখানে ছাত্রপিছু ব্যয় ১৭৫৪ টাকা, গ্রামে তা অর্ধেক, মাত্র ৮৭৩ টাকা। যেখানে গ্রামীণ জনগণই দেশের মূল অংশ সেক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য যত তাড়াতাড়ি দূর করা যায় ততই মঙ্গল।

বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি শিশুমৃত্যুর হার কমানো, জন্মকালে জীবন-প্রত্যাশা বৃদ্ধি এর কোনোগুলোই সরাসরি ব্যক্তিগত আয়ের উপর তেমন নির্ভরশীল নয়। এগুলো মূলত থাকে সাধারণত public action বলা যায় তার উপর নির্ভর করে। এখানে পাবলিক অর্থ কেবল সরকারি নয়; তার অর্থ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দলবদ্ধ প্রয়াস। তা ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে ছুটির সময় গ্রামে সাক্ষরতা অভিযান হতে পারে, হতে পারে রেডিও-টিভিতে খাবার স্যালাইন বানানোর প্রচার, কিংবা হতে পারে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রামে টিউবওয়েল বসানো।

আমি একথাগুলো বলছি এ জন্য যে আজকে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো যে রূপ ধারণ করেছে তা দূরীভূত করা কেবলমাত্র সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, যদিও আমি জানি যে আমার সাথে সবাই একমত হবেন না, তবুও বলছি বেসরকারি উদ্যোগে অনেক কিছুই করার আছে যা আমরা করতে পারি। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিও-র ভূমিকা নিয়ে দেশে একটি বিতর্ক চলছে। আমি যখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে কথা বলছি, তখন আজ যে প্রতিষ্ঠানে আমি এই বক্তৃতা দিচ্ছি, এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর কথাই চিন্তা করে বলছি, যার চারা একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি একদিন রোপণ করেছিলেন এবং যে চারাগাছটি আজ ডালপালা ছড়িয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আমি আদৌ ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলছি না যেগুলো বিদেশী অর্থে বিদেশী পরামর্শদাতাদের পরামর্শে এ দেশীয় কিছু পরজীবীদের স্বার্থে নিয়োজিত।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করব ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা এদেশের আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি অনুসরণ করবেন।

আমি এ বলেই এ প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্রঃ

Alam, Mahmudul, Performance of Non-government Secondary Schools in Rural Bangladesh

Brown, Lester et al, State of the World, 1990

Chowdhury, Omar, H., A Critical Review of Studies on Nutrition in Rural Bangladesh, 1989

Khan, M. R. (ed.), Evaluation of Primary Health Care and Family

Planning Facilities and their Limitations Specially in the Rural Areas of Bangladesh, 1988

Schiff, Maurice and Alberto Valdes,

'Nutrition Alternative Definitions and Policy

Implications, in Economic Development and Cultural Change, January 1990

Sen, Binayak, et al, The Face of Rural Poverty in Bangladesh : Trends and Insights

UNDP, Human Development Report, 1990

World Bank, World Development Report, 1990

গণিত বিভাগের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে উপাচার্যের বক্তৃতা
১-৩ জানুয়ারি, ১৯৯২

সুধীবৃন্দ,

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যায়য় প্রতিষ্ঠার কথা অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছিল। সর্বপ্রথম ১৮৭০ সালে বাংলার তৎকালীন লেঃ গভর্ণর এ প্রদেশে একটি দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯১২ সালে 'নাথান' কমিশন নামে একটি কমিশন গঠিত হয় যার দায়িত্ব ছিল ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা করা। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য এটি আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ১৯১৭ সালে 'স্যাডলার' কমিশন (যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে অবহিত) এর সুপারিশ অনুসারে "ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইন, ১৯২০" নামে একটি আইন প্রণীত হয়, যা ২৩শে মার্চ, ১৯২০ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ করে। এ আইন অনুসারে পি,জে, হার্টগ ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম অবস্থায় আইন কানুন প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে। প্রথম বছর ৮৭৭ জন ছাত্রছাত্রীসহ যে ৮টি বিভাগ শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করে গণিত ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান।

আমি প্রথমেই এ কথাগুলো বললাম এজন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আজ ৭০ বছর। প্রতিষ্ঠানটির ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের একটি পরিকল্পনা আমার ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, গত ৯ মাস যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবস্থা বিরাজমান তাতে অনুষ্ঠানিকভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে কোনো অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। আর তাই যখন প্রথম বছরে প্রতিষ্ঠিত ৮টি বিভাগের মধ্যে অন্তত একটি বিভাগ তার ৭০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে তখন আমি সত্যি অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমার কিছু ধারণার কথা বলতে চাই।

এ কথা ঠিক যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এবং মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণ, অর্থাৎ শিক্ষা ও গবেষণা। কিন্তু এ কথা বুঝতে হবে যে, একজন ব্যক্তির মনের চাহিদা অনেক। আসলে একজন তরুণ-তরুণী কেবলমাত্র চার দেয়ালের মধ্যে লেখাপড়া নিয়ে মগ্ন থাকবে এমন কল্পনা করা বাস্তব নয়। তা'ছাড়া আপনারা এ প্রবাদটির সাথে সুপরিচিত আছেন যে, শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে কেবল ছাত্রছাত্রীরাই থাকে না, থাকে দেশের এবং জাতির ভবিষ্যতও (Tomorrow)। আর সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শিক্ষা গবেষণা ছাড়াও বিভিন্নমুখী হতে বাধ্য। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন রুচির এবং বিভিন্ন মন ও মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে এখানে আয়োজন করতে হয় নানা রকম মনোজ্ঞ বক্তৃতামালা, সমাবর্তন উৎসব, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ক্রীড়া কার্যক্রম ইত্যাদি। আজকে যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে যাচ্ছে এর-ও প্রয়োজন সে কারণেই। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা। বিশেষ করে আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীন এবং প্রবীণদের যে মহামিলন ঘটবে তার মাধ্যমে প্রবীণরা নবীনদের সমস্যা এবং মন-মানসিকতার কথা জানবেন, নবীনরা জানতে পারবে তাদের পূর্বসুরীদের কাছ থেকে, তাদের স্মৃতি থেকে উচ্চারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো দিনের কথা। আর তাই এ ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আমার মতে অনেক। কারণ আমি মনে করি, যে কথা উপরে আমি উল্লেখ করেছি যে, ছাত্রছাত্রীরা কেবল চার দেয়ালের মধ্যে থেকেই তাদের জ্ঞান আহরণ করবে না, করবে জীবনের পাতা থেকে ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠান যখন আমরা করতে যাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই গত সাত দশকে আমরা কি অর্জন করেছি সে সম্পর্কেও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এম, সেন গণিতের প্রথম অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। তবে বছরখানেক পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। অপর একজন শিক্ষক এন, সি, ঘোষ-ও রীডার হিসাবে যোগদান করেন এবং বছর দুই পরে বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। প্রথম দিকে নিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা এখানে অধিককাল অধ্যাপনা করেছেন তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এন, এম, বসুর কৃতী সন্তান ডি, বসু, যিনি ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রফেসর মনিরুর রহমান চৌধুরীর নিকট লিখিত তাঁর এক পত্র থেকে জানা যায় যে, অধ্যাপক বসু তাঁর বাল্যকালীন বন্ধু এস, এন, বোস (পদার্থবিজ্ঞান) এবং আর, সি, মজুমদার (ইতিহাস), জে, সি, ঘোষ (রসায়ন) ও এইচ, ডি, ভট্টাচার্য (দর্শন) এঁদের সাথে একই সঙ্গে কলকাতা থেকে ট্রেন এবং তারপরে স্টিমারযোগে ঢাকায় পৌঁছেন।

নলিনী মোহন বসু সি, ভি, রমনের তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং বছর দু'য়েক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ঢাকায় রীডার হিসাবে যোগদান করেন। এই কৃতী শিক্ষক ২৭ বছর যাবত গণিত বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং এক সময়ে কিছু দিনের জন্য ডঃ হাসানের অসুস্থতার সময় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছিলেন। টি, বিজয়রাঘবন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি খ্যাতনামা গণিতবিদ জি, এইচ, হার্ডির ছাত্র ছিলেন যাঁর তত্ত্বাবধানে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক ডঃ বসু তাঁর পূর্বে উল্লিখিত পত্রে বলেছেন যে, সারা পৃথিবীব্যাপী তিনি অনেক ঘুরেছেন কিন্তু বিজয়রাঘবনের থেকে শ্রেয় শিক্ষক আর দেখেননি। প্রকৃতপক্ষে, বিজয়রাঘবন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণিতবিদ ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং মাদ্রাজের রামানুজন ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত হন। আজীবন অকৃতদার ঋষিকেশ সরকারও একজন সফল শিক্ষক ছিলেন যিনি ভারত বিভাগের কিছুদিন পর ঢাকা ত্যাগ করেন। সুবোধ কুমার মিত্র কেবল যে একজন কৃতী শিক্ষক ছিলেন তাই নয় তিনি এমনই একজন আত্মভোলা ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর আশেপাশে কি ঘটছে তা লক্ষ করতেন না, এ ধরনের কথা তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত আছে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য তিনি অতি শীঘ্রই অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। হীরেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত তাঁর ভদ্রতা এবং স্মিতহাস্যের জন্য সকল ছাত্রের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনিও ১৯৪৮ সালে ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা চলে যান। চিরকুমার মুকুন্দ চন্দ চক্রবর্তীও একজন সফল শিক্ষক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যদিও তিনি পি-এইচ, ডি ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন না কিন্তু সকলেই তাঁকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই জানতেন। দেবব্রত বসু ছিলেন ঢাকারই সন্তান এবং নবকুমার ইনস্টিটিউশন ও জগন্নাথ কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। অত্যন্ত উজ্জ্বল শিক্ষা জীবনের অধিকারী আতাউল হাকিম-ও এ বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন।

গণিত বিভাগের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল গণিত সমিতি যা ১৯২৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণিত সমিতি যেমন গণিতের শিক্ষকদের গবেষণা কর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে তেমনি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন গবেষকের বক্তৃতা থেকে গণিতের নব নব দিক সম্পর্কে পরিচিত হয়ে এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়েছে। গণিত বিভাগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ১৯৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানে ডাবল অনার্স কোর্স প্রবর্তন , যা প্রকৃতপক্ষে অনন্য । এ বিভাগে প্রথম থেকেই যেমন সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন তেমনি বেশকিছু নামকরা ছাত্রছাত্রীও এখান

থেকে বেরিয়েছিল। এঁদের মধ্যে ফজিলতুন নেসা, আবদুল হাকিম, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রধান। প্রথম ব্যক্তি ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা হিসাবে ও দ্বিতীয়জন ডি,পি, আই হিসাবে তাঁদের সফল কর্মজীবন শেষ করেন। ভট্টাচার্য এ বিভাগের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম কালী নারায়ণ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান অডিট সার্ভিসে যোগদান করেন।

সুধীবৃন্দ,

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে গণিত চর্চার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আমার মনে হয় আপনাদের বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি যে, গণিত যে কেবল বিজ্ঞান তা-ই নয়, গণিত প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ভাষা ও প্রকাশ- মাধ্যম। আর তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে গণিত শিক্ষা এবং গণিত গবেষণা । আমরা যদি এ কথা স্বীকার করি যে, বিজ্ঞানের উন্নতি ছাড়া পার্থিব উন্নতি হবে না তাহলে গণিতের চর্চা আমাদের করতেই হবে। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের গণিত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ প্রথম দিকের কৃতী অধ্যাপকরা জ্ঞানের যে মশাল জ্বালিয়ে গেছেন তা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমার যতটুকু জানা আছে বর্তমানে শিক্ষকবৃন্দ Fluid Mechanics, Relativity, Fuzzy Mathematics সহ গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন এবং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন নামী-দামি পত্র-পত্রিকায় গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। আমি জানতে পেরেছি যে, এ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ গণিত চর্চাকে আর ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গণিত গবেষণা কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বিষয় হিসাবে Operations Research, Mathematical Ecology সহ গণিতের নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির কথাও তাঁরা চিন্তা করছেন।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্যন্ত সীমিত বাজেটের মধ্যে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। আমাদের সাধ আছে অনেক কিন্তু সাধ্য খুবই কম। আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু নিতান্তই অর্থের অভাবেই তা হয়ে উঠছে না। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় গণিত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, যাঁরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা তাঁদের সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করতে পারেন। একজন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর জন্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় Alma Mater বা স্নেহময়ী জননী। আমরা যদি সত্যিই তা বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের স্ব-স্ব মায়ের প্রতি যে মায়া-মমতা, ভালোবাসাবোধ থাকে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ও থাকা উচিত । আর তাই যদি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমরা তাঁদের দুঃখিনী মাকে সাহায্য করতে বলি তাহলে কী তা খুবই অন্যায় হবে? প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের যে সমস্ত দেশ থেকে আমরা আধুনিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা পেয়েছি, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বেশি নামকরা, লক্ষ করলে দেখা যাবে সেগুলোতে বেসরকারি অনুদান অনেক বেশি। বেসরকারি অনুদান না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় চিরকাল সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল থাকবে। তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিকল্পনাই সরকারি লাল সুতোয় বাঁধা থাকবে এবং যে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আমরা এত গর্ব করি তাও আমাদের খর্ব হবে। আর তাই আমি প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের যে মাতৃতুল্যা প্রতিষ্ঠানটি অন্তত ৪ বছর ধরে তার স্নেহ-মমতা দিয়ে আপনাদের এক সময় লালন করেছিল তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের যথাযোগ্য ভূমিকা রাখবেন।

একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না যে, এ দেশে এক সময় ছিল যখন এ দেশীয় জমিদাররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন রকম সাহায্য দিয়ে থাকতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৮-২৯ শিক্ষা বছরের বার্ষিক বিবরণীতে দেখতে পাচ্ছি যে, বালিয়াদির জমিদার খান বাহাদুর কাজিমুদ্দিন সিদ্দিকী ৭৯০ খানি বই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এ-ও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, জগমোহন পাল ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ৪ লাখ টাকা অনুদান পেয়ে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও অনেক মহান ব্যক্তি বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এরূপ অনুদান প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে বলা যায়, যদিও গত বছর অর্থাৎ আমার উপাচার্য হওয়ার পরবর্তী এক বছরের মধ্যে, প্রায় ১২টি অনুদান পাওয়া গিয়েছে। অথচ আমার বিবেচনায় আজকে দেশে বিত্তবান লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার মতো মহান ব্যক্তির কেন অভাব তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। আমি অত্যন্ত মুক্তমনে এ কথাগুলো বললাম, আশা করি আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না।

সুধীবৃন্দ,

শীতের এই রোদ্রকরোজ্জ্বল মনোরম সকালে আপনাদের মতো ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি। এ দিনে আমি গণিত বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করবেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বয়ে আনবেন বিরল সম্মান।

নতুন বছরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের জানাচ্ছি অশেষ শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলো আপনাদের জন্য বয়ে আনুক নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ধৈর্যসহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

ফজলুল হক হলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ*

সুধীবৃন্দ,

আমি সর্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমার পক্ষ থেকে আজকের এ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ফজলুল হক হলের বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। একই সাথে যাঁরা অনেক দিনের চেষ্টায় আজকের এ মহতী সম্মেলনের আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। এ ধরনের একটি মহা-মিলনের কথা যখন আমি প্রথম শুনেছিলাম তখন উৎসাহিত হয়েছিলাম। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক হিসাবে আমি সবসময়েই চাচ্ছি যে বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে জানুক তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের অতীত গৌরবের কথা, আর প্রাক্তন ছাত্ররাও এখানে আসুন, দেখুন এবং জানুন আমরা কেমন আছি এবং কেন?

আপনারা জানেন যে, এ হলটি ফজলুল হক মুসলিম হল নামে ১৯৪০ সনের ১লা জুলাই থেকে একটি আলাদা আবাসিক ছাত্রাবাস হিসাবে তার কার্যক্রম আরম্ভ করে। সে সময় এ হলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৬৩ জন, যার মধ্যে আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৩১ জন। এর পরবর্তী পর্যায়ে এ ছাত্রাবাসটিকে নানান চড়াই- উৎরাই পার হতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সনে ছাত্র সংখ্যা কমে ১৭০-এ নামে। আবার তা বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে তা ৪৯৩-এ পৌঁছে, যার মধ্যে আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৩,১২৯ জন, যা সর্বকালে সর্বোচ্চ। প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে সলিমুল্লাহ হলের মূল ভবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ভবনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছাত্রদের নিয়ে এ হলটির যাত্রা আরম্ভ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন কলাভবন ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সামরিক হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্ররা সরে গিয়ে ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হোস্টেলে আশ্রয় নেয়। সেই পুরনো ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হোস্টেলটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানের ফজলুল হক হল এ অবস্থায় এসেছে। এখন এ হলের আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ৬২৬ জন।

---

* ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২-এ প্রদত্ত।

নানান অসুবিধার মধ্য দিয়ে এ হলটিকে সবসময় চলতে হয়েছে—এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি এ হলের প্রভোস্ট হিসাবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। এ হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন প্রাচ্যভাষা বিশারদ ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ। তারপরে আসেন মীর্জা নাথন রচিত এ দেশের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের এক অমর দলিল বাহারিস্তান-ই-গায়বীর সফল অনুবাদক ডঃ এম, আই, বোরা। এ ছাড়া সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ মাহমুদ হোসেন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ আব্দুল হালিম, ডঃ মির্জা নূরুল হুদা প্রমুখ ব্যক্তিগণ পরপর প্রথম দিকের প্রভোস্ট ছিলেন। এসব ব্যক্তির সংস্পর্শে যে সমস্ত আবাসিক ছাত্র এসেছেন তাঁরাও পরবর্তী জীবনে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেছেন বা এখনো করছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। তা হচ্ছে এর আবাসিক চরিত্র। এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ একে অপরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় বেশি। এর আবাসিক চরিত্র এবং এর টিউটোরিয়াল পদ্ধতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে উঠেছিল বলে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে "প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" বলা হতো। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী কক্ষের বা গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষা এবং গবেষণার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের একজন কৃতী শিক্ষক লিখে গেছেনঃ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে এর ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠিত করেছিল তার মূলে ছিল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংযোগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপরিচিতদের সমষ্টি ছিল না। এটা যেন শিক্ষক ও ছাত্রদের একটা যৌথ পরিবার।" উল্লেখিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোই ছিল উদ্দেশ্য। আর তাই আমরা আশ্চর্য হই না যখন দেখি যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এ আবাসিক হল থেকে যে সমস্ত ছাত্র বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং ১৯৯০-৯১ এর জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব সাহাবুদ্দীন আহমদ একজন। এ হলের প্রাক্তন আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে, আমার জানামতে, অন্তত ৫ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ লাভ করেছেন। এ ছাড়া অন্তত ১৪ জন বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী হিসাবেও দেশের সেবা করে গেছেন বা করছেন। আজকের এ অনুষ্ঠান যিনি উদ্বোধন করেছেন তিনি-ও বর্তমান সরকারের একজন মাননীয় মন্ত্রী। বর্তমানে সরকারের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব,

উপ-সচিব ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবেও অনেক কৃতী ব্যক্তি নিয়োজিত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ হলের ছাত্র জনাব আবুল এহসান ১৯৬০-৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ হলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জানামতে হলের ছাত্রদের মধ্যে অন্তত ৫ জন কালী নারায়ণ বৃত্তি পেয়েছেন।

আমাদের অর্জনের পাশাপাশি আমাদের কিছু দুঃখ-দৈন্যের কথাও আমি অকপটে আপনাদের সামনে বলতে চাই। যদিও আজকের এ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এ হলটি কিছুটা নবরূপে আপনাদের সামনে আবির্ভূত, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা এখন ভীষণ প্রকট, খাবার ঘর, ক্যান্টিন এবং অডিটোরিয়ামের অবস্থা আরো করুণ। পাঠকক্ষের অভ্যন্তর, ক্রীড়াকক্ষ ইত্যাদিতে কোনো সাজ-সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। আর এখানকার কর্মচারীদের বাসগৃহের কোনো ব্যবস্থাই আমরা করে উঠতে পারিনি।

এ অবস্থা বহুদিনের জমে থাকা সমস্যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে গত দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয় নিদারুণ অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনাদির যে মূল্য তা সংরক্ষণের জন্যই প্রতি বছর ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন, সেখানে আমরা পাই মাত্র ৭০/৮০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এক-দশমাংশ। স্বভাবতই সমস্ত ভবনের জীর্ণদশা এবং বেশির ভাগই আসবাবপত্রবিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক হিসাবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই যখন দেখি আমার প্রিয়ভাজন ছাত্রছাত্রীরা এ অবস্থায় বাস করছে। কিন্তু কি-ই-বা করার আছে আমাদের? গত বছর বাজেটের ঘাটতি ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা। সবক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ব্যয় করে কোনো রকমে আমরা সে অবস্থা থেকে উত্তরিয়েছি। কারণ নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণের অধিকার তো বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি প্রায় দুই কোটি টাকা। স্বভাবতই টান পড়ছে আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এ অবস্থা থেকে আমরা কি করে পরিত্রাণ পেতে পারি? অনেকে বলে থাকেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সমাজ সেবামূলক অপরিহার্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, অতএব এর দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণই সরকারের এবং এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারকে বহন করতে হবে। আমি বিষয়টি কিছুটা ভিন্নভাবে দেখি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব মূলত সরকারের, কিন্তু তারপরেও কথা থাকে যে আমাদের যত রকমের সমস্যা আছে সবকিছু কি সরকারি অনুদানে মিটবে? এছাড়াও আরেকটি প্রশ্ন এসে যায়, যা-ও খুব মৌলিক। তা হচ্ছে এই যে, আমাদের সব চাহিদার জন্য যদি সরকারের কাছে যেতে হয় তাহলে যে স্বায়ত্তশাসন অতি যত্নে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই তা কখনো কখনো হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এ দেশে একটি সময় ছিল

যখন সামন্তপ্রভুরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং অনুদান দিয়ে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজকে আমাদের বিত্তশালী লোকের সংখ্যা অনেক। তাঁরা যদি মনে করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের 'আলমা মেটা' তাহলে তাঁদের এ মাতৃতুল্যা প্রতিষ্ঠানটির জন্য কি তাঁদের কিছুই করণীয় নেই?

আমি জানি যে ফজলুল হক হলের প্রাক্তন ছাত্রদের ফজলুল হক হল এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন রয়েছে। আমাকে অনুমতি দিলে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশনকে এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। সত্যিকারে বলতে কি পশ্চিমা দেশের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুব নামকরা সেগুলো মূলত বেসরকারি অনুদানে চলে। যদি এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন ফজলুল হক হল ট্রাস্ট ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করার উদ্যোগ নেন তাহলে আমি জানি এ ঐতিহ্যবাহী হলটির প্রাক্তন ছাত্ররা তাতে নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে অনুদান দিতে সম্মত হবেন। আমরা মোটা অংকের একটি ফান্ড পেলে তা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে তার লভ্যাংশ থেকে এ হলের কোনো কোনো সমস্যা দূর করতে পারি। আমি আবার-ও বলতে চাচ্ছি যে, কেবলমাত্র সরকারের একার পক্ষে দেশের সব সমস্যা সমাধান করা সুকঠিন। আমি অত্যন্ত মুক্তমনে কথাগুলো বললাম—আপনারা ভেবে দেখলে বাধিত হবো।

এক সময় ছিল যখন অনেক বড় মাপের ব্যক্তিরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় আসতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ অনেকেই। এ হলে-ও তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ,কে, ফজলুল হক, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাসেম, রাজনীতিবিদ্ জনাব তমিজুদ্দীন খাঁন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, খ্যাতনামা আইনজীবী জনাব এ,কে, ব্রোহী, ছাত্রদের অতিপ্রিয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জনাব হোসেন শহীদ সোহেরাওয়ার্দী বিভিন্ন সময়ে এ হলে তাঁদের পদধূলি দিয়েছেন ও ছাত্রদের সামনে তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্য দিয়েছেন। সন্দেহ নেই এসব ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা অনেক ছাত্রকেই প্রভাবিত করেছে।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা আজ যাঁরা আপনাদের এক সময়ের প্রিয় হল পুনর্বার পদার্পণ করেছেন তাঁদের এ কারণেই আমি স্বাগত জানিয়েছি। আপনাদের সংস্পর্শে কিছু সময় কাটিয়ে আজকের ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আপনারা-ও জানুন নবীনদের কি সমস্যা, তাদের মন-মানসিকতা কিরূপ, কেন তারা অস্থির।

ফজলুল হক হল সুবর্ণ জয়ন্তী সফল হোক এই কামনা করে ও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ*

সম্মানিত প্রধান অতিথি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রিয়ভাজন সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী :

আমার বক্তৃতার প্রারম্ভেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সকল সদস্য/সদস্যাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল অথচ জয়ী হতে পারেনি তাদেরও আমি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার জন্য অভিনন্দিত করছি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সহৃদয় সদিচ্ছা না থাকত তা হলে ডাকসু নির্বাচন যে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে তা রক্ষা করা যেত না। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ও সৌহার্দ্যের পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে আমরা আশা করব তা শুধু আগামী দিনে অটুটই থাকবে না বরং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হবে। এ নির্বাচনের ফলে এরূপ একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রশাসন নিরপেক্ষ ও আন্তরিক হলে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা থাকলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। আমরা আশা করি এর প্রভাব জাতীয় জীবনেও পড়বে।

নির্বাচন চলাকালীন এবং তৎপরবর্তী সময়ে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল তার জন্য ছাত্রছাত্রীরা যেমন ধন্যবাদের পাত্র তেমনি একই সাথে একথাও বলতে হয় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ নির্বাচনের সময় যে ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য তাঁদেরকেও আমি অকুণ্ঠ চিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা,

আমি এ সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এখানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক অথবা প্রশাসনের সাথে তাদের কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত সে

---

* ২৫ জুলাই, ১৯৯০-এ প্রদত্ত।

বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। গত চার মাসে আমি অবশ্য সে সব কথার কোনো কোনো দিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি। প্রথমেই বলি সন্ত্রাসের কথা। বিগত কয়েক বছরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে কেবল যে এক ডজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণই এখানে প্রাণ দিয়েছে তাই নয়, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে বার বার। শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে গেছে, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা তাদের লেখা পড়ার ব্যয় বহন করতে পারছে না, ছাত্রাবাসে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে চরমভাবে, খাবারের মান হয়েছে নিম্ন, স্থানাভাব দেখা দিয়েছে প্রতিটি বিভাগে, ইনস্টিটিউটে, পাঠকক্ষে, গ্রন্থাগারে ও গবেষণাগারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তারুণ্যের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের পরিবর্তে শত্রুতার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। সব কিছু মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে জন্ম নিয়েছে হতাশা। তরুণ জীবনের হতাশার জের চলে বহুদিন। হতাশ ব্যক্তিরা নিজেদের জন্য ভালো কিছু করতে পারে না, সমাজের জন্য তো নয়ই। আমরা দেশের জন্য চাই টগবগে তরুণ, যাদের চোখে থাকবে স্বপ্ন, বুকে থাকবে আশা, আর কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হবে দেশপ্রেম। কিন্তু সন্ত্রাস নামক দানব সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরমার করছে এবং গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আমি সকল ছাত্রছাত্রীকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব একটি উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে আমাদের পক্ষে সময়, সম্পদ, সুযোগ ও প্রতিভার অপচয় করার কোনো অবকাশ আছে কি?

এ কথা বলছি আরো এ কারণে যে তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছ, তাদের আমি ভাগ্যবান মনে করি। প্রতি বছর হাজার হাজার যোগ্য ছাত্রছাত্রী আকুল আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হবার জন্য এখানে ছুটে আসে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাদের অধিকাংশকেই আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর যে ব্যয় হয়, তার সামান্য অংশই ছাত্রদের কাছ থেকে আসে। বাকি বিপুল অংশ বহন করে যারা পড়ার সুযোগ পায় না, তাদের অভিভাবকেরা এবং এ দেশের দরিদ্র জনগণ। সে কথা মনে রেখে নিজেদের জীবনপদ্ধতি ও জীবনস্বপ্ন গড়ে তুলবার জন্য তোমাদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক হিসাবে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কর্মজীবনে দেশের সেবা করা সকলেরই উচিত, ছাত্র জীবন হবে তার জন্য প্রস্তুতিপর্ব। দেশ বলতে শুধু একখণ্ড ভূমি বোঝায় না, দেশ বলতে বুঝি যাদের ঘামে ও শ্রমে এই সমাজ গড়ে উঠেছে, তাদের। আমাদের তরুণদের সব আন্দোলন ও তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার কাজে।

প্রায় মাস দেড়েক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর যখন গত এপ্রিল মাসে আবার

বিশ্ববিদ্যালয় তার দরজা উন্মুক্ত করল তখন একজন প্রবন্ধকার এক সাপ্তাহিকীতে লিখেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, অবশেষে শেষ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশুভ অনির্দিষ্ট কাল। ছাত্রছাত্রীরা ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে অধিকাংশই—তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখের ঝিলিক দেখে, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি শুনে বোঝা যায় ফিরে আসার জন্য তারা ব্যাকুল ছিল কতটা। যেন প্রিয় মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিল, অনেক দিন উদ্বাস্তুর মতো ফিরেছে বিভুঁয়ে, ছিঁড়ে গিয়েছিল তাদের সমস্ত শেকড়, নিভে গিয়েছিল স্বপ্ন, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ছিল মাতৃভূমির জন্য, এবং একদিন হঠাৎ মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পারাটিই সুখ, যদিও তাদের অসুখের অভাব নেই। ঝলমল করছে বিশ্ববিদ্যালয়, চৈত্রের রোদ তাকে আরো আলোকিত করে তুলেছে। এক সপ্তাহ ধরে আবার তারা ক্লাস করছে, ছুটছে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, বারান্দাগুলো মুখর করে রাখছে, ঢুকছে গ্রন্থাগারে, কেউ কেউ গিয়ে বসছে তাদের নিভৃত স্থানটিতে। কয়েক বছরে এতটা শান্তির এক সপ্তাহ দেখিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিছিলের পর মিছিল নেই, হঠাৎ বোমা ফাটার আতঙ্ক নেই, সবাই যেন বিশ্বাস করছে এখন কোনো অশুভ ঘটনা ঘটবে না। পরিবেশ এত শান্ত, এতই প্রীতিকর যে পথে পথে দাঁড়ানো পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়েও বিরক্তি জাগে না। যদি এমন শান্তি এক সপ্তাহের জন্য না এসে এক শতাব্দীর জন্য আসত তা হলে সুখী হতাম।"

বলা বাহুল্য আমরা কেউই এক শতাব্দী বেঁচে থাকব না; বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানের প্রশ্ন তো আসেই না। কিন্তু প্রবন্ধকার যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে অনন্তকাল ধরে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকার পূর্বশর্ত হচ্ছে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা আশা করব ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে সতত সজাগ থাকবে এবং ইতিমধ্যে তারা যে সহ-অবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের আদর্শ সৃষ্টি করেছে তা অব্যাহত থাকবে।

এরপরে যে বিষয়টির আমি অবতারণা করতে চাই তা হচ্ছে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা আমরা যাদের কাছে পেয়েছি তাদের কথাই যদি বলি তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান চর্চাকারীদের একটি সমাজ। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কনিষ্ঠ জ্ঞানার্জনকারী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা জ্যেষ্ঠ জ্ঞানার্জনকারী। এই দুয়ের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। তাই যদি হয় তাহলে আমরা যারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী তাদের মাঝে দুর্ভেদ্য দেয়াল থাকবে কেন? আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয় কারখানার শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের মতো হতে পারে না বা এদেশের শতকরা

আশি ভাগ অধিবাসী যারা কৃষক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে যারা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁদের মধ্যে যে দূরত্ব বা সম্পর্ক তাও হওয়ার কথা তো নয়। আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সাহায্যকারীর সম্পর্ক, এবং স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। আমি যেহেতু মনেপ্রাণে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে এই সম্পর্কের কথাই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সেজন্যই ব্যথিত হই, যখন দেখি ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সাথে তাদের সমস্যার কথা বলার সময় বলে অভিযোগের সুরে। মনে হয় আমরা যেন একে অপরের প্রতিপক্ষ। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই, বর্তমান প্রশাসন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে কখনোই অবস্থান গ্রহণ করবে না এবং আমাদের শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা যাঁরা শিক্ষক এবং প্রশাসক তাঁরা সব সময় চেষ্টা করে যাবো আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাওয়ার। আমি আশা করব ছাত্রছাত্রীরাও আমাদেরকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে একদিন শিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল, তার একটি প্রধান কারণ ছিল ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে সুসম্পর্ক। এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারের প্রথম দিকের একজন কৃতী শিক্ষক লিখে গেছেন ঃ

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে এর ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠিত করেছিল তার মূলে ছিল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংযোগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপরিচিতদের সমষ্টি ছিল না। এটা যেন শিক্ষক ও ছাত্রদের একটা যৌথ পরিবার"। আমি জানি আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ও আকৃতি, ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যার বিচারে, তখনকার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। তাই হয়তো যৌথ পরিবারের অনুশীলন পরিপূর্ণভাবে আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু এমন কি কারণ থাকতে পারে যে আমি আমাদের যে সম্পর্কের কথা উপরে উল্লেখ করেছি তা থাকবে না? আমি জানি এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দিক থেকে আগ্রহের কোনো অভাব নেই। আমরা আশা করব, ছাত্রছাত্রীরাও সমান আগ্রহ নিয়ে আমাদের মধ্যে সুসম্পর্কের নতুন এক সেতুবন্ধনের সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসবে।

প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

আজকের এ অভিষেক অনুষ্ঠানে ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছাত্ররা রাজনীতি করবে কি করবে না আমি অবশ্য সে

সম্পর্কে এই মঞ্চ থেকে কোনো মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ হ্যাঁ বা না একথা বলে এর উত্তর দেয়া যাবে না। তবে এতটুকু বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, তরুণরা যারা কিছুদিন পরেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে তারা দেশ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত হবে না বা নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে না এমনটি কল্পনা করা আদৌ সমীচীন নয়। তাই কেউ চান আর না চান কোনো-না-কোনো ধরনের ছাত্র-রাজনীতি থাকবেই। কিন্তু প্রশ্নটি এইখানে, সে রাজনীতি কি ধরনের হবে? যদি তা আদর্শ বিবর্জিত হয় এবং আন্দোলনের নামে শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা হয় বা একটি সংগঠনকে অন্য একটি সংগঠনের মুখোমুখি দাঁড় করায় তা হলে তা কাম্য হতে পারে না। এর বিষময় ফল কি হতে পারে তাও আমরা দেখেছি। এ ছাড়া আর একটি কথা বলাও প্রাসঙ্গিক হবে তা হচ্ছে এই যে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে কিনা। ছাত্রসমাজের এসব কথা ভেবে দেখা দরকার; তাদের নিজেদের স্বার্থেই এবং দেশের ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে। আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ করেছি যে, নবনির্বাচিত ডাকসু নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরে মিছিল করে ক্লাশের ব্যাঘাত ঘটাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের এই একটি ঘোষণায় অকুণ্ঠ প্রশংসা তারা অর্জন করেছে শিক্ষক সমাজের কাছ থেকে। আমরা বহুদিন থেকে এ ধরনের একটি অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজকে তা না চাইতেই পেয়েছি। এ ঘোষণার মাধ্যমে ডাকসু নেতৃবৃন্দ যে কেবল নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করেছে তাই নয় তারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা আশা করব সকল সংগঠন ডাকসুর ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে চলবে।

প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও সুধীবৃন্দ,

আমরা বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ করে আসছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্যক্রম, যা সহ-শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে সাধারণত বলা হয় এবং সে অর্থেই যা পুঁথিগত বিদ্যার পরিপূরক, সে ধরনের কার্যক্রমের উদ্যোগ খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। আমি আগে যে যৌথ পরিবারের কথা উল্লেখ করেছি তা প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ-সুবিধা ছিল তার মাধ্যমেই গড়ে উঠত। আমি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই ধারণাও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেবার চেষ্টা করছি যে

ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠার জন্য সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম আরও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। নবনির্বাচিত ডাকসু এবং একই সাথে হল সংসদগুলো এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি। ডাকসু ও হল সংসদের নেতৃবৃন্দের সাথে আমার যে দিনকয়েক আগে একটা আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার ভিত্তিতে শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করব ডাকসু ও হল সংসদসমূহ এই কমিটির সম্মানীয় সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক অনুদানের যে প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহের জন্য আমরা চেষ্টা করব।

সুধীবৃন্দ,

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে লক্ষ করছি যে বিশ্ববিদ্যালয় আজ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। কোনো কোনো মহল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু কিছু অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জানিনা এতে দেশের এবং দশের কি সুবিধা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটা জাতীয় আমানত। সমাজের যে-কোনো খানে বা কোনো স্তরেই ক্লেদ থাকুক না কেন তা সংশোধনের জন্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এর ছাত্র-শিক্ষক সকলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে সমাজ কি লাভবান হবে?

দুর্ভাগ্য যে, ছাত্র-শিক্ষকদের সাফল্যের কথা দেশবাসী খুব অল্পই জানতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বে যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, আজকের শিক্ষকবৃন্দ কমবেশি তা সংরক্ষণ করে চলেছেন। তবে যেহেতু আজকে সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি, তাই আমাদের সব অর্জনের কথা বাইরে প্রচারিত হয় না। অথচ প্রতি বছরই শিক্ষকবৃন্দের গবেষণা প্রশংসিত হচ্ছে এবং অত্যন্ত উন্নতমানের বিষয়ভিত্তিক পত্রিকায় দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হচ্ছে। এসব প্রকাশনা-গবেষণার অনেকগুলোই জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে। এগুলোর খবর ক'জন রাখে? বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকচক্ষে হেয় করে কোনো লাভ হবে না এবং তা দেশের জন্য ক্ষতিকারকই হবে। তাই আমি সকল মহলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব যেন তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই না করে অযথা আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলা হয়।

প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও সুধীবৃন্দ,

আমার বক্তব্যের শেষাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। স্বায়ত্তশাসনের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে এবং থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোনোরূপ বিতর্ক নেই এবং এই বিষয়ে আমার মনেও সামান্যতম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এর সাথে অন্য আর একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আজ আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী। একথা ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাই তাকে চালু রাখা দেশের সরকারেরই প্রধানত দায়িত্ব। কিন্তু এরূপ সরকারের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে স্বায়ত্তশাসন সব সময় রক্ষা করা যাবে কি না এবং আমাদের ইচ্ছা মাফিক ঈপ্সিত সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিতে পারব কিনা সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ আছে। এ দেশে অনেক বিত্তবান ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত ৭০ বছরে অনেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা যদি তাঁদের "আলমামেটা" বা স্নেহময়ী মাতৃতুল্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিছু সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করতেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে শিক্ষা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে পারত। আমি আশা করব আমার এই আবেদনে অন্তত কেউ কেউ সাড়া দেবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় তো দেশের সব মানুষেরই। সমাজকে সেবা করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষক-প্রশাসক সকলেই আমরা প্রস্তুত। কেবল চাই সেই পরিবেশ। আমি আশা করব সকলেই সে পরিবেশ সৃষ্টির কাজে এগিয়ে আসবেন।

সুধীবৃন্দ,

আজকের এই উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে অত্যন্ত খোলামন নিয়ে কিছু কথা বললাম। আপনারা সকলে এগুলো সদয়ভাবে বিবেচনা করলে খুশি হব। আমার প্রিয়ভাজন সকল ছাত্রছাত্রী, উপস্থিত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুধীমণ্ডলীকে অশেষ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৯০

সম্মানিত সিনেট সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সিনেটের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি তাঁদের যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে আজ প্রথমবারের মতো সিনেট অধিবেশনে যোগদান করছেন। আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে যে, সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন ১৯৮৭ সালের জুন মাসের পরে আর হয়নি। গত ৩রা মে সিনেটের যে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমি আমার বক্তব্যে আগের প্রায় তিন বছর যাবৎ সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলাম। তাই আজ আর আমি এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করছি না। আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, যখন প্রতি বছর সিনেটের অধিবেশন হতো তখন উপাচার্য মহোদয় পূর্ববর্তী বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় সিনেট সদস্যদের সামনে একটি চিত্র তুলে ধরতেন। গত ৩ বছরের সবকিছু অনুরূপভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রধান দিকগুলো অবশ্যই তুলে ধরা হবে।

এ সময়ের মাঝে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল নামে কুয়েত সরকারের সাহায্যে ৩৭৮ সীট বিশিষ্ট ছাত্রীদের একটি হলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিগত ১৯-৫-৯০ তারিখ থেকে কিছুসংখ্যক ছাত্রী সেখানে বসবাস করছে। উত্তর ফুলার রোডে ১০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য একটি ভবনের নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। শিববাড়ী এলাকায় ৪টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য অপর একটি ভবনের নির্মাণ কাজও শেষ হয়েছে। ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার ভবন, উক্ত ইনস্টিটিউটের জন্য ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ২টি আবাসিক ভবন ও ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ৫ তলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনটিও সম্পূর্ণ মেরামত করে সম্প্রতি তা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আবাসিক হল ও ভবন ছাড়াও বিজ্ঞান

ভবনের দ্বিতীয় তলার নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ঈশা খাঁ রোডে ১০টি ফ্ল্যাটবিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন, প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিমাংশের তৃতীয় তলা, বখশিবাজার এলাকার ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ২০টি ফ্ল্যাট এবং মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের ৩য় তলা নির্মাণের কাজের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, এ ভবনগুলি নিঃসন্দেহে প্রয়োজন এবং সত্যিকারে বলতে কি, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু একই সাথে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় তার দালানকোঠার সংখ্যা বা চাকচিক্যের উপর নির্ভর করে না; যার ওপর নির্ভর করে তা হচ্ছে প্রধানত এখানকার শিক্ষা কার্যক্রমের উৎকর্ষ ও এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তাধারা কতখানি প্রতিফলিত হচ্ছে তার ওপর। এ ক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ ইতিমধ্যে নিয়েছে। যেমন—১৯৮৯ সালে বাংলা বিভাগে "নজরুল অধ্যাপক" নামে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং একই সময়ে "নজরুল গবেষণা কেন্দ্র" খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এ বছরের ২৪শে মে নজরুল গবেষণা কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জাতীয় কবির জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা। কলা অনুষদে নাট্যকলা বিষয়ে সাবসিডিয়ারি পর্যায়ে পাঠদান আরম্ভ হয়েছে এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ওদিকে বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু নতুন চিন্তা-চেতনা সঞ্চারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিগত ১৭-১২-৮৭ তারিখে কম্পিউটার বিভাগ খোলার জন্য অনুষদের সভায় প্রথমবারের মতো একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটির মাধ্যমে সম্প্রতি আগামী বছর থেকে এ বিভাগটিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে। ৩০-৮-৮৮ তারিখে বিজ্ঞান অনুষদের অধীন ভূতত্ত্ব বিভাগে "ব-দ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র" নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান অনুষদের সভায় গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তটিও বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে এখন সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়াও বিজ্ঞান অনুষদে সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কে কোর্সদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১২-৬-৮৮ তারিখের বিজ্ঞান অনুষদের সভার এ সিদ্ধান্তটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা আশা করব শীঘ্রই তা বাস্তবায়িত হবে।

আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে এ সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ছাড়াও বিদেশী কোনো কোনো সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন—ভূগোল বিভাগে সিডার আর্থিক সহায়তায় "ডিজাস্টার রিসার্চ সেন্টার" নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে সরকারের অনুমতি এখনও পাওয়া যায়নি বলে আমরা প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করতে পারিনি। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর জন্য ঢাকাস্থ এশিয়া ফাউন্ডেশন একলক্ষ পঁচাশি হাজার ডলারের আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে। একই বিভাগের সাথে সাদার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিনিময় আরও জোরদার হবে। সম্প্রতি আমরা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে এখনও পৌছেনি, তবে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা যা হয়েছে তা থেকে এটুকু বলা যায় যে, হোস্টেল ভবন নির্মাণ, গবেষণাগার নির্মাণ বা সম্প্রসারণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি খাতে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মতো সাহায্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়া, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সিস সাহায্যের আওতায় আমরা প্রথম পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি পাচ্ছি, যা ইতিমধ্যেই এসে পৌছেছে। এ বিষয়েও আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল গত ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকাশনার উদ্যমকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকাশনা বিভাগকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা গঠনের একটি প্রস্তাব সিন্ডিকেট গ্রহণ করে। এই সংস্থাটি শীঘ্রই পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকদের রচিত ৬টি, ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে ৭টি এবং ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ৭টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে আরও ৫টি পুস্তকের মুদ্রণ কাজ সমাপ্তপ্রায়। আমরা আশা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা যখন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হবে তখন পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

সম্পূর্ণ বৈরী একটি পরিবেশে যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কাজ করছেন

তবুও তাদের গবেষণা ও প্রকাশনা দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। আপনাদেরকে যে বার্ষিক বিবরণটি দেয়া হয়েছে তাতে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব গবেষণা জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে। জৈব রসায়ন বিভাগের ডঃ আনোয়ার হোসেন ও ডঃ জেবা ইসলাম সেরাজের পরিচালিত জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে লবণাক্ত মাটিতে উৎপাদনযোগ্য ধান উদ্ভাবন এরূপ একটি গবেষণা প্রকল্প যা পরিচালনার জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশন ৬৩,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছে। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেছেন এবং তাঁদের অবদান রেখেছেন। চারুকলা ইনস্টিটিউটের বেশ কয়েকজন শিক্ষক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পুরস্কার লাভ করেছেন এবং প্রায় অধিকাংশ শিক্ষক অনেকগুলো আন্তর্জাতিক শিল্পকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণায় দুটি আঞ্চলিক কর্মশিবির অনুষ্ঠান এখানে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলো হচ্ছে 'সোলার থারমাল অ্যান্ড ফটোভল্টিক কনভারসন' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশিবির, 'আন্তর্জাতিক বোস সিম্পোজিয়াম এবং কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিকস' সংক্রান্ত কর্মশালা। এই কর্মশালাসমূহ সম্পাদনে সহায়তাদানের জন্য আমরা ইউনেস্কোসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি নামে ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৯-এর জানুয়ারি মাসে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই মাসে অস্ট্রেলিয়া এবং ডিসেম্বর মাসে গ্লাসগোতে পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিতর্কে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। প্রিন্সটনে তারা তিনটি বিতর্কে জয়ী হয়, অস্ট্রেলিয়ায় ৫টি এবং গ্লাসগোতে ৪টিতে বিজয় লাভের গৌরব অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের আমরা অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খেলাধুলার ক্ষেত্রেও আমাদের ছাত্ররা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অব্যাহতভাবে বজায় রেখেছে। ১৯৮৯-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বছর ৩১শে মে আমাদের ক্রিকেট দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল সাত বার চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। হকি খেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল অবশ্য রানার্স-আপ হয়েছে। ১৯৮৯-এর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত

জাতীয় ক্যারাতে প্রতিযোগিতায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দল একটি স্বর্ণপদক দুটি রৌপ্যপদক ও তিনটি তাম্র পদক লাভ করে। এ ছাড়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শামসুন নাহার হলের ছাত্রী ফারহাদ জেসমিন লিজি মহিলাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়।

সিনেটের মাননীয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ,
আমি মাত্র তিন মাস আগে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই যদিও সব সময়ই একটি সমস্যাসঙ্কুল সময়ের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তবুও ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী তথা এই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আমি বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, অথবা উদ্যোগ নিয়েছি। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে আমার সাক্ষাৎকারের সময় আমি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের পরিবহণ সমস্যার কথা অবহিত করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকদের জন্য দুটি মাইক্রোবাস ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২টি বড় বাস অনুদান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এগুলো পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সাল থেকে সরকার বিভিন্ন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জমি হুকুম দখল করেছে এ সম্পর্কেও আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছি। তিনি সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত দলিলপত্রসহ তাঁর সাথে পুনর্বার আলোচনা করার জন্য আমাকে বলেছেন। ইতিমধ্যে গত ২রা জুন অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির সাথে উপাচার্যদের মাসিক সভায় তিনি কাটাবন এলাকায় ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরশন নির্মিত দোকানগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যাবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। এই দোকানগুলো আমাদের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়ে আমরা ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রধান মাননীয় মন্ত্রী জনাব নাজিউর রহমানের সাথে আলাপ করেছি এবং আশা করা যায় শীঘ্রই আমরা এগুলোর স্বত্বাধিকার পাব। বৃষ্টি-বাদলের দিনে ছাউনীর অভাবে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে বলে র‍্যাংগস লিমিটেড-এর কাছে কতগুলো যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমাদের এই অনুরোধ তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন এবং শীঘ্রই ক্যাম্পাসে আমাদের নির্ধারিত স্থানে ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বাসরুটেও কতগুলো যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনুমতি প্রয়োজন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে যাতে গতিশীলতা আনয়ন করা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকাণ্ড যাতে পরিকল্পনা মাফিক চলতে পারে সেজন্য ২১-৪-৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় কতগুলো কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলো হচ্ছে:

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাস্টার প্ল্যান কমিটি

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ কমিটি

(ঘ) গবেষণাগার উন্নয়ন কমিটি।

(ঙ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি।

(চ) অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কমিটি

এই কমিটিগুলো শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করবে এবং আমরা আশা করব যে, বিশ্ববিদ্যালয় এতে উপকৃত হবে।

সম্মানিত সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা জানেন কি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমনই ছিল যে, অনেকে ধারণা করেছিলেন যে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আর খোলা সম্ভব না। উপাচার্য হিসেবে আমার নিয়োগ লাভের পর ১২ দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বার খোলা হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল শতকরা আশি ভাগ এবং তার ২-১ দিনের মধ্যেই তা শতকরা ৯৫ ভাগ ছাড়িয়ে যায়। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে খোলা অবস্থায় দেখতে চান। এরপর এই মাসের ৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে কোনোরূপ উত্তাপ বা উত্তেজনা তো হয়ইনি বরং নির্বাচনের পূর্বে ও পরে পরিবেশ ছিল সব সময় উৎসবমুখর। এই সবকিছুর জন্য আমি এককভাবে কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে চাই না। কারণ আমি বিশ্বাস করি কোনো মহৎ অর্জন একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। গত তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয় যে সুষ্ঠুভাবে চলছে এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সরকার, বিশেষ করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা। বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলোও সন্ত্রাসবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমি সকলকে বিনীতভাবে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করব আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমেও সকলের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এ দেশের

একজন প্রখ্যাত কবি কিছুদিন আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকাতের গ্রাম বলে অভিহিত করেছিলেন। আমি শুনতে পাই সে মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এখন সবেমাত্র উষার আলোক দেখা যাচ্ছে। আমাদের পেরোতে হবে অনেক পথ সারাদিন ধরে।

প্রথমত, সেশন জ্যামের দুষ্টগ্রহ আমাদের সমস্ত কর্মউদ্যমকে হ্রাস করছে। যেমন করেই হোক এই অভিশাপ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত করতেই হবে। এই বিষয়ে আমি বার কয়েক বিভিন্ন অনুষদের মাননীয় ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সাথে আলাপ করেছি। একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তাঁদের সামনে হাজির করার জন্য তাঁরা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা আশা করি শীঘ্রই আমরা এ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করতে সমর্থ হবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের সে মনোভাব অব্যাহত থাকবে এই বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধা হলেও তাঁরা তা স্বীকার করে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি অন্তত এ প্রতিষ্ঠানের এবং জাতির বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য। দ্বিতীয়ত আমাদের কিছু ভৌত সুযোগ-সুবিধার অভাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। আমাদের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলের জন্যই বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত আবাসিক হলে বাস করে সেগুলোর সংস্কারও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের খাবার অত্যন্ত নিম্ন মানের। আমি নিজে যেহেতু একজন শিক্ষক তাই অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি নিবেদন করতে চাই, শিক্ষকদের কাছে এ সমাজের আশা এবং দাবি অনেক। শিক্ষকরা যেখানে স্বেচ্ছায় এ পেশায় এসেছেন, সেখানে তারা এর সুবিধা-অসুবিধা জেনেই এসেছেন একথা যেমন ঠিক তেমনি এও তো সত্য যে, মানুষ ইথারের জগতে বাস করে না, তাকে এই কাদা মাটির পৃথিবীতে বাস করতে হয়। অতএব জাগতিক জীবনে শিক্ষকদেরও কিছু চাহিদা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, যখন দেখি যে ৬০% ভাগ শিক্ষকের ক্যাম্পাসে বসবাসের কোনো ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতই এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, যাঁদের মাসিক উপার্জনও কম। ঢাকা শহরে এসব তরুণ মেধাবী শিক্ষকদের যদি বাসা ভাড়া করে থাকতে হয় তাহলে কি করুণ অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ ছাত্রছাত্রীকে আমরা আবাসিক সুবিধা দিতে পারছি। বাকি ছাত্রছাত্রীরা কোথায় এবং কিভাবে থাকে আমরা তার খোঁজ নিতেও পারছি না। এ. এফ. রহমান হলের ছাত্ররা বহুদিন যাবত তাদের হলের জন্য একটি দালান নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছে। আমরা এ দাবি

অত্যন্ত যৌক্তিক বলে মনে করি। কিন্তু আমাদের আবর্তক বাজেটের অবস্থাই যখন নুন আনতে পান্তা ফুরায়-এর মতো তখন উন্নয়ন বাজেটের কি অবস্থা হতে পারে বলতে পারছি না। সামগ্রিক অবস্থা যখন এই, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত হলে সব সময় যদি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে এর জন্য দায়ী করা হয় তাহলে সেটি সর্বক্ষেত্রে যথার্থ হবে না। অন্যদিকে আমাদের সব প্রয়োজন সরকারকে মেটাতে হবে এ ধরনের ধারণা থেকে আমরা যদি সমস্যা সমাধানের কথা ভাবি তাহলে আমার মনে হয় না যে আমরা কোনো দিন তা করতে পারব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আজ ৭০ বছর। এখান থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাঁরা কি তাঁদের আলমামেটা বা এই "স্নেহময়ী মায়ের" প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ আছে বলে মনে করেন না? যদি তাঁরা তা মনে করেন তাহলে আমরা আশা করব যে, তাঁরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করবেন।

সম্মানিত সিনেট সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন যে, আজকের সভায় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের কোনো প্রতিনিধি নেই। আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যে সময় হাতে ছিল তাতে তাঁদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। আমরা আশা করছি আগামী শিক্ষা বছরে যাতে বিধি মোতাবেক রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং তাদের প্রতিনিধি আবার আমাদের সাথে বসতে পারেন সে বিষয়ে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সম্মানিত সিনেট সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান নীতি নির্ধারণী সংস্থা সিনেটের সম্মানিত সদস্য-সদস্যা হিসেবে আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং পরামর্শ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আপনারা উদ্যোগী হবেন আমি বিনীতভাবে এই আবেদন করছি।

আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ, ১৯৯১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,
আমি ১৯৯০-১৯৯১ শিক্ষাবছরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে আপনাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। বরাবরের মতো আপনাদের উপস্থিতি এবং সিনেটের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আপনারা যে দিক্ নির্দেশনা দিবেন তা আগামী বছরের জন্য আমাদের চলার পথে সহায়ক ও মূল্যবান হবে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে গত বছর সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্যসূচির কিছু অংশ অসমাপ্ত রেখে সিনেটের কার্যক্রম আমরা স্থগিত করে ছিলাম। তিন মাসের মধ্যে সিনেটের আরেকটি অধিবেশন হবে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্তও আমাদের ছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্দোলনের জন্য এ অধিবেশন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সিনেটের মুলতবি সভা অনুষ্ঠানের জন্য আমরা একটি তারিখও ঘোষণা করেছিলাম। তারিখটি ছিল ৮ই ডিসেম্বর। কিন্তু ৮ই ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী কয়েক দিন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। ফলে অবস্থা এমন অনিশ্চিত ছিল যে, সিনেট অধিবেশন সম্ভব হবে না এটি ভেবেই আমি পুনরায় ৩রা ডিসেম্বর তারিখে উক্ত অধিবেশনের তারিখ স্থগিত করার নির্দেশ দেই। সিনেটের মুলতবি অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত করা যায়নি বলে আমরা দুঃখিত। তবে গত বছরের অধিবেশনের অসমাপ্ত আলোচ্য বিষয়াদি এ বছরের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিনেটের মুলতবি অধিবেশন না করতে পারায় আমাদের অক্ষমতা সামগ্রিক পরিবেশ বিবেচনা করে আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা করি।

মাননীয় সিনেট সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,
আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, গত বছর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের সময় সিনেটের যে গঠন ছিল আজকে তা কতখানি আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য সিনেট নামক এই সংস্থাটি যখন ১৯৭৩-এর

আদেশে সংযোজিত হয় তখন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি এ সংস্থায় থাকবেন এটি ঠিক করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ—এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের তাঁদের প্রিয় স্নেহময়ী মাতৃতুল্যা (Alma Mater) প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া। কিন্তু সিনেটের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহল এটিকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। ১৯৭৩—আদেশের রচয়িতারা এ কথা চিন্তা করেননি যে, অতি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ আইনের ফাঁক দিয়ে জাল ভোটের মাধ্যমে নিজেদেরকে নির্বাচিত করার প্রয়াস পাবেন। সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে এই ত্রুটি সম্পর্কে বহুদিন থেকে আমরা অবহিত ছিলাম। বিগত দিনে এর বিকল্প হিসেবে কিছু কিছু পন্থাও গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সাফল্যজনক হয়নি। গত বছর সিনেটে আমরা রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত স্ট্যাটিউট সংশোধন করি, যার ফলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে আজকের এই সিনেট সভায় যে সমস্ত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি বসে আছেন তাঁরা সত্যিকারভাবে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ এই প্রথমবার কোনোরূপ কারচুপি, কোনোরূপ ভোট জালিয়াতি, মৃত ব্যক্তির পক্ষে ভোট দান ইত্যাদি হতে পারেনি। তাই আজ যাঁরা রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের প্রতিনিধি হিসেবে এই অধিবেশনে যোগদান করছেন তাঁদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করছি। এছাড়াও রয়েছেন বর্তমান সংসদের পাঁচ জন মাননীয় সদস্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র প্রশ্নাতীত। আমরা তাঁদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ দেশের সর্ববৃহৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা কি দেখুন, জানুন, বুঝুন এবং এখানকার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এর উন্নতিকল্পে মতামত দিন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,
গত এক বছরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কতটুকু এবং কি করতে পেরেছি তার একটি খতিয়ান উপাচার্যের ভাষণে আপনারা নিশ্চয়ই আশা করছেন। কিন্তু এ খতিয়ানটি দেয়ার আগে আপনাদের সানুগ্রহ অনুমতি নিয়ে কি অবস্থার মধ্যে গত এক বছর আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়েছে তা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

উপাচার্য পদ লাভের সাথে আমি অনেক কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কি অবস্থার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে কেবল তা বুঝাবার জন্যই দুঃখজনক

হলেও এগুলোর উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ১৯৮৫-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯০ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ ক্যাম্পাসে দু'জন বহিরাগত ও ১০ জন ছাত্রসহ মোট ১২ জন তরুণের প্রাণহানি ঘটে।

মার্চ মাসে আমি উপাচার্যের পদ গ্রহণ করি। স্বভাবতই যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি উপাচার্য হই সে অবস্থায় প্রধান কাজই ছিল ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ আরও অনেকের সহায়তায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে সমর্থ হই এবং আমার দায়িত্বভার গ্রহণের আড়াই মাসের মধ্যে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ডাকসুসহ হল সংসদসমূহের নির্বাচনও সম্পন্ন হয়। কিন্তু তারপরেও গত এক বছর ধরে আমি দুঃখজনকভাবে লক্ষ করছি যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে যায় এবং কখনও কখনও তারা এমন বৈরী মনোভাব নিয়ে মুখোমুখী হয় যে, তার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। আমি উপাচার্য হওয়ার পর থেকে গত ১৫ মাসে যদিও এখানে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি কিন্তু যে সময়ে ছাত্ররা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রত ছিল সে সময়টুকু শুধু বাদ দিলে প্রায় সব সময়েই তাদের মাঝে এ বৈরীভাব লক্ষ করা গেছে এবং কখনও কখনও এক সংগঠন এবং আরেক সংগঠনের মাঝে সংঘর্ষ, আবার কখনও কখনও একই সংগঠনের মাঝে অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে ক্যাম্পাসে শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে প্রতিনিয়ত থাকতে হচ্ছে বলে সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আমরা সময় দিতে পারছি খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক হিসেবে এ কথা উল্লেখ করতে আমি ব্যথিত হচ্ছি খুবই, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে বলতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি সমস্যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি বহুদিনের জমে থাকা অনেক সমস্যা। এখানে উদাহরণ হিসেবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(ক) আমার উপাচার্য পদে আসার আগে বিজ্ঞাপিত অনেকগুলো পদে নির্বাচনী পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনিতেই অধ্যাপক অথবা সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য মাস ছ'য়েক লেগে যায়। আমি উপাচার্য পদে আসার প্রথম ২-৩ মাস প্রাথমিক বাধাগুলো কাটিয়ে উঠার পর যখন এদিকে নজর দিতে পারলাম তখন দেখলাম যে, ১৯৮৪ সাল থেকে ৬ বছরে বিভিন্ন বিভাগের নির্বাচন পর্ষদের অনেকগুলো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

(খ) বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পরিষদের সভাও সব সময় নিয়মিত

হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৮-র পরে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কতগুলো মামলা মোকদ্দমার জন্য বি.জি.'র সভা বারিত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক উদ্যোগ নিলে যে এ সমস্যার সমাধান করা যেত না তা নয়, কেননা, এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি এ ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের আমার সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম। তাঁরা এসেছিলেন এবং একটি সমঝোতার মাধ্যমে যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি ছিল তা নিরসন করা সম্ভব হয়েছিল ও ডিসেম্বর, ১৯৯০-এ বি.জি.'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(গ) সিন্ডিকেটের আলোচ্যসূচিতেও অসংখ্য বিষয় অসমাহিত অবস্থায় বহুদিন পড়েছিল। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। ১৯৮৮-৮৯ সালে সিন্ডিকেট সর্বমোট ৩২২টি আলোচ্যসূচির ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮৯-৯০ সালে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগে সিন্ডিকেট ৪০৬টি এবং আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে ১৩৮টি সহ মোট ৫৪০টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ বছর ৬ই জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৬৬০টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এখন সিন্ডিকেটের আলোচ্যসূচিতে একেবারে সাম্প্রতিক বিষয় ছাড়া একটি বিষয়ও নেই। এ সময়ের মধ্যে ১৯৮৭ সাল থেকে জমে থাকা এবং নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ২১টি তদন্ত কমিটি সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) আপনারা যে সিনেটে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন এবং যে সিনেটকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের মূল স্তম্ভ বলে ধরা হয় সেই সিনেট সভার উপরে একবার নিষেধাজ্ঞা এসেছিল ৮৮ সালের ২২শে জুন এবং দ্বিতীয় বার ৮৯ সালের ২৮শে জুন। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমি উপাচার্য পদে আসার আগে সিনেট অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

তৃতীয়ত, অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে আমরা আমাদের অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। দেশের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সকল ক্ষেত্রে বাজেট পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের মধ্যে সীমিত করে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে আমাদের প্রথমে জানানো হয় ২রা মে, ১৯৯০ তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আমাদের ন্যূনতম চাহিদা মিটানোর জন্য আমরা ২.০৮ কোটি টাকা ঘাটতিসহ গত সিনেটে বাজেট পেশ করি। আমাদের আশা ছিল যে, সংশোধিত বাজেটে আমাদের চাহিদা মেটানো হবে। কিন্তু বহু দেন-দরবার করার পরেও সর্বশেষ এ বছরের ১৫ই মে তারিখে আমাদের

সংশোধিত বাজেট এবং আগামী বছরের বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পর্কে জানানো হয়েছে। হঠাৎ করে গত বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে তা এতই কম যে, আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমগুলো চালিয়ে নেয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে এ বিষয়ে বহু দেন-দরবার করা হয়েছে, কিন্তু সুরাহা হয়নি। তার পরেও মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে আমরা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারিনি। বাজেট আলোচনার সময় আপনারা অবশ্য আরো এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং এসব বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিতে পারবেন।

কি অসুবিধার মধ্যে গত এক বছর আমাদের কাজ করতে হয়েছে কেবল এ কথা বুঝাবার জন্য আপনাদের সামনে কতগুলো তথ্য তুলে ধরলাম।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এ সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। কিন্তু এর পূর্বশর্ত স্বভাবতই এখানকার পরিবেশকে এর জন্য অনুকূল রাখা। এ উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করে চলেছি।

১। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসসমূহ চালু রাখা ;

২। শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য যে সমস্ত পদক বা পারিতোষিক রয়েছে, যা বহুদিন পর্যন্ত দেয়া হয়নি, সেগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করা।

৩। বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় যে সমস্ত মনোজ্ঞ বক্তৃতামালা বহুদিন যাবত অনুষ্ঠিত হয়নি সেগুলোর আয়োজন করা ;

৪। ছাত্রছাত্রীদের ডাকসুর এবং হল সংসদের মাধ্যমে সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহ দান করা;

বিশ্ববিদ্যালয় যাতে খোলা থাকে, ক্লাস এবং পরীক্ষাসমূহ যাতে নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত হয় এ জন্য আমরা সবসময়ই সতর্ক থেকেছি এবং প্রকৃত পক্ষে, গত ১লা জুলাই থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র একবারই এক সপ্তাহের জন্য অনির্ধারিত বন্ধ দেয়া হয়। বন্ধটি ছিল ১১-৫-৯১ ইং থেকে ১৬-৫-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত এবং কারণ ছিল উপকূলীয় অঞ্চলে যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয় সে এলাকায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ত্রাণ কার্যে অংশ গ্রহণের অথবা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখা সাক্ষাৎ করার সুবিধা দান। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন এ রকম ধারণা জন্মেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই খোলা থাকবে। আর তাই তারা এ ধরনের অবস্থার সাথে নিজেদেরকেও খাপ খাইয়ে নিচ্ছে বলে আমাদের অনুমান।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গবেষণাকর্মে উৎসাহ দানের জন্য ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক, আবদুর রব চৌধুরী স্বর্ণপদক, হরি প্রসন্ন রায় স্বর্ণপদক এ তিনটি স্বর্ণপদক রয়েছে। এ ছাড়া কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাজমুল করিম স্মারক স্বর্ণপদক, চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক, সালেকুন্নেসা স্বর্ণপদক, রোন পোলেনক স্বর্ণপদক, আবুল মনসুর আহমদ স্বর্ণপদক নামে কয়েকটি স্বর্ণপদক রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক বছর যাবত এগুলো প্রদানের বিষয়ে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। যেমন ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক সর্বশেষ মঞ্জুর করা হয় ১৯-৬-১৯৮৪ তারিখে, গত সাত বছরে এ সম্পর্কে আর কিছুই করা হয়নি। এ বছর ট্রাস্টি বোর্ডের সভার সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৯-৯০ এ দশ বছরের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন অধ্যাপককে এ স্বর্ণপদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শিক্ষকদের তালিকা সংযোজিত, পরিশিষ্ট-১)। অনুরূপভাবে আবদুর রব চৌধুরী স্বর্ণপদক সর্বশেষ দেয়া হয়েছিল ৪-১২-৮৫ তারিখে। এ সম্পর্কেও আমরা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছি (আবদুর রব চৌধুরী স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের নাম সংযোজিত, পরিশিষ্ট-১)। হরি প্রসন্ন রায় স্বর্ণপদকও সর্বশেষ ঘোষিত হয়েছিল ২১-৪-৮৬ তারিখে। পাঁচ বছর পর আমরা এবার এগুলো ঘোষণা করেছি। অবশ্য অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে ১৯৮৭ এবং ১৯৮৯ এর হরি প্রসন্ন স্বর্ণপদক প্রাপ্তদের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক নেই। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যে সমস্ত স্বর্ণপদক দেয়া হয় তা অপেক্ষাকৃত নিয়মিত। স্বর্ণপদক দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন গত কয়েক বছর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি তেমনি অনুরূপভাবে বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ডের সঞ্চয় থেকে যে সমস্ত মনোজ্ঞ বক্তৃতামালা আয়োজনের কথা সেগুলোও গত কয়েক বছর অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ পণ্ডিত ব্যক্তিদের বহুদিনের গবেষণা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ মতামতের ভিত্তিতে রচিত মনোজ্ঞ বক্তৃতা অনুষ্ঠান সর্বদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেসব বক্তৃতামালা এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) কবি মতিউর রহমান ও সালেকুন্নেসা বক্তৃতামালা ১৯৮২ সালের পর পূনর্বার এ বছর ৭ ও ৮ই মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) বিচারপতি ইব্রাহীম স্মারক আইন বক্তৃতা ১৯৮৬ সালের পর এ বছর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) কামিনী কুমার দত্ত স্মারক বক্তৃতা ১৯৭০ সালের পর এ বছর ২৫ ও ২৬শে মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) সাইদুর রহমান বক্তৃতামালা ১৯৮৫ সালের পর ১৯৯০ এর অক্টোবরে একটি এবং ১৯৯১ এর মার্চ মাসে আরেকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

যেসব বৈশিষ্ট্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ উপমহাদেশের অন্যান্য বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চালু ছিল এবং এর শিক্ষক-শিক্ষকা এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সকলেই ক্যাম্পাসে অবস্থান করতেন। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ সুসম্পর্কের আরেকটি কারণ ছিল এই যে, যেহেতু এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাই এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আবাসিক হলসমূহে ছাত্রছাত্রীরা অবস্থান করত। আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তায় ও পরিচালনাধীনে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করত। এর ফলে একদিকে ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটত, অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্ক হতো সত্যিকার অর্থে Friend, philosopher and guide-এর। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহচর্য লাভ। এ কথা মনে রেখেই আমরা চেষ্টা করেছি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহ দান করতে। এর ফলে আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন যে, এ বছর প্রতিটি হলে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া কার্যক্রমে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ পেয়েছে এবং অংশগ্রহণ করেছে। ডাকসুর নেতৃত্বাধীন এসব কার্যক্রমের মধ্যে যা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে অভিষেক অনুষ্ঠান (২০শে জুলাই-১৯৯০), শারদীয় বিতর্ক উৎসব-১৯৯০, পথ নাটক উৎসব (১১-১৬ই ডিসেম্বর), বিজয় দিবস প্রীতি ফুটবল ম্যাচ (৫ই জানুয়ারি-১৯৯১), আন্তঃহল ভলিবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃ হল বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ডাকসুর সাংস্কৃতিক সপ্তাহ (৯-১১ই ফেব্রুয়ারি-১৯৯১), সাহিত্য মেলা (১৬-২০শে ফেব্রুয়ারি-১৯৯১), স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (২৬শে মার্চ, ১৯৯১), আন্তঃ বাসরুট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এছাড়া তারা একটি রক্তদান কর্মসূচির মতো কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে। ডাকসুর মুখপত্র ছাত্র বার্তাসহ গত এক বছরে বিভিন্ন সময়ে ডাকসুর ১২টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে। ডাকসুর

বাৎসরিক ম্যাগাজিন শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমি জানতে পেরেছি। ডাকসু ১৭ থেকে ২০শে জুন একটি সাহিত্য সপ্তাহ পালনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ছাত্রছাত্রীরা ডাকসু এবং হল সংসদের আওতায় বাইরেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থিওসফিক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে আন্তঃহল কুইজ প্রতিযোগিতার এবং সর্বপ্রথম ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ও তাতে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের আরেকটি সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি গত ১৬-২০শে আগস্ট, ১৯৯০ আবৃত্তি ও উচ্চারণের উপর একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। অনুরূপভাবে গত ২৩-২৬শে সেপ্টেম্বর তারা একটি বিতর্কের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের এসব উদ্যোগকে সব সময়ই আমরা উৎসাহিত করেছি।

এ বছর বিভাগীয় উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিভাগীয় পর্যায়েও বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা এ গুলোর মধ্যে যতটুকু তথ্য পেয়েছি সেগুলোর এখানে উল্লেখ করছি।

(ক) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৫ই জানুয়ারি, ১৯৯১ থেকে ১০ই জানুয়ারি, ১৯৯১ পর্যন্ত ময়নামতি ইটাখোলা মোড়া খনন কাজে অংশগ্রহণ করে। উক্ত বিভাগে ২২শে মে, ১৯৯১ তারিখ "কৃষক সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা ১৭-২১শে মার্চ পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করে।

(খ) বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ বিভাগের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৮ই ফেব্রুয়ারি সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ বছর এ বিভাগে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ডঃ অশোক কুমার শক্তির "আধুনিক বাংলা কবিতা" সম্পর্কে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ সত্যবতী গিরি "মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। বিভাগে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়।

(গ) মনোবিজ্ঞান বিভাগে ৮ই মার্চ, ১৯৯১ তারিখে বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উদযাপন করা হয়।

(ঘ) মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগে ৪০ বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয় এবং এ উপলক্ষে "মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা" সম্পর্কে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

এ দিকে হল পর্যায়ে জসীমউদ্‌দীন হল কবি জসীমউদ্‌দীনের মৃত্যু দিবস পালন করে এবং এ উপলক্ষে সম্মান ও স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পরীক্ষায় হলের যে সকল

ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সকলকে হল সংসদের পক্ষ থেকে কবি জসীমউদ্‌দীন পদক প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া হল সংসদ এ বছর প্রথম বারের মতো হল বার্ষিকী "নিমন্ত্রণ" প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। অপরদিকে রোকেয়া হলে ২১শে জানুয়ারি রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

বিভিন্ন সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে আগস্ট বায়োটেকনোলজি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি সেমিনার, ৭ই জানুয়ারি বাংলাদেশ দর্শন সমিতির উদ্যোগে দর্শন কংগ্রেস ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশ উদ্ভিদবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে উদ্ভিদবিজ্ঞানী কনফারেন্স, ২৯শে জানুয়ারি বাংলাদেশ প্রাণিবিদ সমিতির উদ্যোগে প্রাণিবিজ্ঞান সম্মেলন ও বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে ৬ই ফেব্রুয়ারি সমাজ বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ফেডারেশন অব এশিয়ান এণ্ড ওসেনিয়ান এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এ মাসের ১১ তারিখে প্রাণ রসায়নবিদদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এসব সম্মেলন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কোনো কোনোটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজনও আয়োজিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কার্যক্রমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে হল সংসদগুলোর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে শিক্ষা সফর। এ সফর ২৯শে মে-১৫ই জুন এর মধ্যে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ হারুন-অর-রশিদ ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক জনাব রুহুল আমিন আকন্দও এ দলটির সহযাত্রী ছিলেন।

গবেষণাধর্মী সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান, বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন এবং বিভাগ ও হল পর্যায়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কার্যক্রম এ বছরের অনুকূল পরিবেশের জন্য সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এ ধরনের বিভিন্নমুখী শিক্ষা এবং সহ-শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু সারা বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের জগতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আস্থা বেড়েছে বলে আমাদের ধারণা। এখানে আপনাদের একটি তথ্য আমি দিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় আজ ৭০ বছরের পুরনো। বেসরকারি অনুদানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হবে এটি একটি বিশ্বের সর্বস্থানে প্রচলিত

রীতি। গত ৭০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের প্রায় ১০০টি বিভিন্ন অংকের অনুদান পেয়েছে, যেগুলি ট্রাস্ট ফান্ড হিসেবে আমরা পরিচালিত করে থাকি। এ সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা জেনে সুখী হবেন যে, গত এক বছরেই আমরা ১২টি অনুদান পেয়েছি। এগুলোর তালিকা সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-২) এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন প্রাক্তন শিক্ষক বর্তমানে নর্থ কেরোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবদুল লতীফ চৌধুরী তাঁর মরহুম পিতা জনাব আবদুর রব চৌধুরীর নামে ১০ লক্ষ টাকার একটি অনুদান আমাদের দিয়েছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য যার নাম হবে 'চেয়ার ফর ম্যাথেমেট্রিক্যাল ফিজিক্স'। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত অনুদানে চেয়ার প্রতিষ্ঠা এই প্রথম।

একই সাথে আমার ধারণা, বিদেশীদেরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত এক বছরে ঢাকাস্থ বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক অথবা গবেষকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য এসেছেন। এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাঁরা উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন তাঁদের একটি তালিকা সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-৩)। আপনাদের অনুমতি নিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা আসতে চেয়েও অনুকূল পরিবেশ ছিল না বলে আগে তা সম্ভব হয়নি। এখন এখানে আসতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। অনেকে তাঁদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্প অথবা শিক্ষক-গবেষক বিনিময় প্রকল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট কর্মসূচি থাকলে তাও ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শুভ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ফরাসি সরকার ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বছরের জন্য ভূগোল বিভাগে একটি ও অর্থনীতি বিভাগে আরেকটি তরুণ শিক্ষকদের জন্য গবেষণা বৃত্তি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। এ বৃত্তি নির্বাচনের জন্য আমরা কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়েছি। ফরাসি সরকার আমাদের এখানে যেহেতু আমরা সাবসিডিয়ারি পর্যায়ে ফরাসি ভাষা চালু করতে যাচ্ছি সেহেতু বাড়তি আরেকজন শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়া বিনিময় কর্মসূচির আমার একটি মৌখিক অনুরোধ ফরাসি দূতাবাসের বিবেচনাধীন রয়েছে। চীনা রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ আমরা একজন চীনা শিক্ষক জুলাই মাসে পাব বলে আশা করছি, যাঁর বেতন-

ভাতাদি সবই চীন সরকার বহন করবেন। আমাদের কেবলমাত্র দায়িত্ব থাকবে তাঁর আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা। জাপান সরকারও একজন ভাষা শিক্ষকের ব্যয়ভার অব্যাহত রাখবেন। নিউব্রুন্সউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ স্টারী, ডীন, ফ্যাকাল্টি অব এডমিনিস্ট্রেশন এর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় এবং কেনেডিয়ান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎকারের সময় উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি আছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ চুক্তির আওতাধীন এখনো ৩ জন শিক্ষক কানাডায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য লেখাপড়া করছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আরও কয়েকজনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। সম্প্রতি বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফার্নান্ড ল্যাম্বেইন এর উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির আওতায় গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হারুন কাদের ইউসুফ ল্যাথারিজমের উপর গবেষণা করার সুযোগ পাবেন।

গত ২৮শে মার্চ ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আইন অনুষদের সাথে আইন বিভাগের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক বিনিময় প্রোগ্রাম সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ চুক্তির আওতায় ১৯৯১-৯২ থেকে আগামী তিন বছরের জন্য প্রতি বছরে তিনজন করে আইন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ব্রিটেনের উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি আইন অনুষদের ডীন মহোদয় এ চুক্তির আওতায় বৃটেন পরিভ্রমণ করে এসেছেন।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আলোচ্য বছরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিচালনাধীন এম. ফিল ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রি প্রাপ্তদের সংখ্যাও গত ৬ বছরের মধ্যে এবারে সর্বাধিক যথাক্রমে ৮ ও ২২। এ ছাড়া আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মধ্যে এ বছর যাঁরা পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ এ.বি. মোসলেহউদ্দিন, রিসার্চ এসোসিয়েট ডঃ এ. টি. এম. আবদুল গণি, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ডঃ সিদ্দিকা মাহমুদা ও ডঃ আখতার কামাল, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহসানুল হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ডঃ গোলাম মোস্তফা ও ডঃ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডঃ মোঃ ইব্রাহীম ও ডঃ হাবিবা খাতুন।

এ বছর শিক্ষকদের রচিত পাঁচটি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো চারটির মুদ্রণ কাজ চলছে।

আলোচ্য বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের শিক্ষক-সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। এঁরা হলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ, যিনি স্বৈরশাসন পতনের পর দেশে যে নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় তার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আমিনুল ইসলাম স্বাধীনতা পুরস্কার, চারুকলা ইনস্টিটিউটের জনাব আবদুল বাসেত, ইংরেজি বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক ডঃ সালাহউদ্দিন আহমদ ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ হারুন-অর-রশীদ ২১শে পদকে ভূষিত হয়েছেন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন পরিবেশ সংরক্ষণে অনবদ্য অবদানের জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা (ইউ. এন. এ. পি) কর্তৃক গ্লোবাল ৫০০ রোল অব অনার ১৯৯০ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের জনাব শাকুর শাহ জাপানে চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় পদক পেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এম. শমসের আলী থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সাইন্সেস-এর একাডেমি অব সায়েন্স থেকে গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক ও নগদ ২৫,০০০.০০ টাকা পেয়েছেন। আমরা উচ্চতর ডিগ্রি প্রাপ্তদের, পদকপ্রাপ্ত এবং বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে এ বছর ১৬৬ জন বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ভিজিটর্স প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় 'অর্থানুকূল্য' দিয়েছে তাঁদের একটি তালিকা সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-৪)।

মাননীয় সিনেট সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বা সহ-শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করেছি। কিন্তু শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমও স্বভাবতই গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর প্রয়োজন আরও এ কারণে যে, একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও বাসস্থানের চাহিদা বেড়েছে, অন্যদিকে সাত দশকের পুরনো এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের জীর্ণদশা এবং লাইব্রেরির করুণ অবস্থা এ চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাস্তবিকপক্ষে এ সব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই যে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, যা প্রকৃতপক্ষে আগামী ১লা জুলাই আরম্ভ হতে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা ১৩৮,২৭,৭৩,০০০ (একশত আটত্রিশ কোটি সাতাশ লক্ষ তেয়াত্তর হাজার) টাকার একটি উন্নয়নের রূপরেখা দেই। পরিকল্পনা কমিশন থেকে আমাদের

জানানো হয় যে, আমাদের পরিকল্পনা ২০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। স্বভাবতই আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু পরবর্তী পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনায় বাদ দিতে হয়েছে। আরও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, ১০-৬-৯১ তারিখে এক পত্র মারফত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাদের জানিয়েছে যে, পূর্ব প্রতিশ্রুত ২০ কোটি টাকার পরিবর্তে প্রকৃত পক্ষে আগামী পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় মাত্র ৮.৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা কি? তবুও আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এরই অংশ হিসেবে এ বছর খোন্দকার বিজ্ঞান ভবনের প্রথমতলা (২,৮৬২ বর্গ মিটার) নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের তিনতলার অংশ বিশেষের (৫০৬ বর্গ মিটার) নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এ ছাড়া খোন্দকার বিজ্ঞান ভবনের তিনতলা (২,৮৬২ বর্গ মিটার) এবং কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্টের বাংলো ও ৪ জন হাউস টিউটরের ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। অনুন্নয়ন খাত থেকে এদিকে আমরা গবেষণা অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, বই-পুস্তক ও জার্নাল ক্রয়ের জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। অনুন্নয়ন খাত থেকে ছাত্রদের জন্য একটি বাস ইতিমধ্যেই কেনা হয়েছে এবং একটি এম্বুলেন্স কেনার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সম্প্রতি ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দুটি বাস অনুদান হিসেবে পেয়েছি। এজন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুন্নয়ন খাত থেকে ফুলার রোডে এবং ঈশাখাঁ রোডে ১০টি করে মোট ২০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। এদিকে আমরা নিমতলী জাদুঘরের ৪.২৩ একর জমিসহ যে ভবনটি উদ্ধার করেছি সেটিকে নবরূপ দান করে ১০টি অতিথি কক্ষসহ ৪০টি ফ্ল্যাট তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

গত সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে আমি আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন বা সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য কতগুলো কমিটি গঠন করা হয়েছে। নানা কারণে একমাত্র গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ কমিটি ছাড়া অন্য কোনো কমিটির কাজ সম্পন্ন হয়নি। গ্রন্থাগার উন্নয়ন কমিটি গ্রন্থাগারের

সমস্যাবলি চিহ্নিত করে আমাদের নিকট একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। এদিকে গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের জন্য আমরা এশিয়া ফাউন্ডেশনের সাথে যে আলাপ আলোচনা করেছিলাম তার ফলে এশিয়া ফাউন্ডেশন একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে কনসালট্যান্ট হিসেবে এখানে পাঠাবেন। তিনি এসে গ্রন্থাগারের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন দেবেন। এই উভয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এশিয়া ফাউন্ডেশন আমাদের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনার কোনো কোনো অংশ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি।

প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির কাজ খুব একটা বেশি এগোয়নি। তবে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যেমন— ইতিপূর্বে বিধান ছিল যে কোনো শিক্ষক-অফিসার-কর্মচারী তাঁর মঞ্জুরীকৃত ছুটি শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরে আসলে তাঁকে উপাচার্যের নিকট যোগদান পত্র দাখিল করতে হতো। আমরা সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্সটি পরিবর্তন করে যাতে এখন থেকে চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক অথবা অফিস প্রধানের নিকট যোগদান পত্র দাখিল করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের বহুদিনের প্রচলিত আরেকটি বিধান ছিল যে, কারও কোনো পাওনা এক বছরের বেশি পুরনো হয়ে গেলে তা পরিশোধের জন্য উপাচার্যের নিকট আবেদন করতে হতো। এ অর্ডিন্যান্সও সংশোধন করে ক্ষেত্র বিশেষে উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার অথবা কন্ট্রোলারকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও দক্ষ করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ আরো কোথায় কোথায় সম্ভব আমরা সেগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি এবং আশা করা যায় যে, এ প্রক্রিয়া চালু থাকবে।

প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেশ কিছুদিন যাবত আমরা অনেকগুলো মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েছি। সৌভাগ্যবশত গত বছর অর্থাৎ আলোচ্য বছরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা অন্তত ৬টি মামলার নিষ্পত্তি করেছি এবং ৪টিতে আমাদের পক্ষে রায় হয়েছে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর বিস্তৃতি ছিল প্রায় এক বর্গমাইল (৬০০ একর)। অবশ্য ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া-এর পক্ষ থেকে ঢাকার কালেক্টরের যে চুক্তি হয় তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৫২.০৭ একর জমি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি মাঝে মাঝে সরকার হুকুম-দখল করে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, এ নিয়ে ১৯৫৫ সালে জাস্টিস ফজলে আকবরের নেতৃত্বে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩১৫ একর জমি বরাদ্দ দেয়ার সুপারিশ করে। তবে প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে বাড়তি জমি পাওয়া তো দূরের কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জমি সরকার হুকুম-দখল করে নিয়ে গিয়েছিল তাই কোনোদিন ফেরৎ দেয়া হয়নি। এদিকে জাতীয় জাদুঘর নির্মাণের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব জমি ছেড়ে দিতে এই শর্তে রাজি হয় যে, পুরাতন জাদুঘরের জমি ও ভবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিনিময়ে দেয়া হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে খুব একটা বড় রকমের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। আমি এ বিষয়ে ২০শে আগস্ট ১৯৯০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নিকট বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ এবং ম্যাপ সন্নিবেশিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করি। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় নিমতলী জাদুঘরের ভবন ও গৃহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে কাঁটাবন এলাকায় যে জমির ওপর ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দোকান নির্মাণ করেছে আমরা তাও দাবি করি। এ দাবিটা অবশ্য আগেই করা হয়েছিল। এ বিষয়েও রাষ্ট্রপতির সাথে উপাচার্যদের এক সভায় এ দোকানগুলো আমাদেরকে হস্তান্তর করার কথা রাষ্ট্রপতি জানান। এদিকে সরকার পরিবর্তন হওয়ার ফলে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় লাগে। তবে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি এবং সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে এই যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এ দোকানগুলো আমাদেরকে হস্তান্তর করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে ২০-৪-৯১ তারিখে এক পত্র মারফত জানিয়েছে। আমরা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আশা করা যায় শীঘ্রই এর একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং সেশন জ্যাম সম্পর্কে আপনাদের অবহিত না করলে আমার দায়িত্বে ত্রুটি রয়ে যাবে। আমি আমার বক্তৃতার প্রথম দিকে উল্লেখ করেছি যে, গত ১৫ মাসে এখানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কোনো প্রাণহানি হয়নি। একথা সত্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত তা আদৌ বলা যাবে না। আসলে মাঝে মাঝে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটে যে, তা গোলাগুলি বিনিময় পর্যায়ে চলে যায়। বিগত এক বছরে এ ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে এবং প্রাণহানি না ঘটলেও গুলিবিদ্ধ হওয়ার

ঘটনা বা ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট আহ্বান এবং প্রায়শই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তার মাধ্যমে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঠেকিয়ে রেখেছি। তবে যে-কোনো সময় তা বিস্ফোরিত হতে পারে। ঘটনা দৃষ্টে আমার ধারণা, ডাকসু এবং হল সংসদসমূহের নির্বাচন যতই কাছে আসছে বিভিন্ন সংগঠন ততই তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং এ চেষ্টার মাধ্যম হচ্ছে অস্ত্রের জোর। আমরা বারবার বলেছি, এখনো বলতে চাই যে, সন্ত্রাস বহিরারোপিত এবং ক্যাম্পাসে ব্যবহৃত অস্ত্রের উৎসও ক্যাম্পাসের বাইরে। অতএব তা নিরসনের উপায়ই হচ্ছে প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোকে সংযত রাখার অঙ্গীকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা। আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা সম্পর্কের বিষয়ে বর্তমান প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। একই সাথে আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে ছাত্র সংগঠনগুলোর মূল রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান করব তারা যেন তাদের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনগুলোকে সংযত রাখেন। তা যদি না হয় তাহলে এ জাতি এবং দেশের জন্য ভবিষ্যৎ শুভ তো নয়ই বরং তা অত্যন্ত তমশাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই তখন যখন দেখি যে আমাদের এই ছাত্ররাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছে, কিন্তু আজ তারা কোনো এক অশুভ ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে।

এদিকে সেশন জটের কবল থেকে আমরা খুব একটা বের হতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে শিক্ষকদের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে আমার বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। চারদিকে যখন সন্ত্রাসের হানাহানি, একজনের প্রতি অন্যজনের অনাস্থা এবং প্রায় প্রতিটি সংগঠনই সাংগঠনিক সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ তখন আবার গর্বিত হই যখন দেখি আমার এই প্রিয়ভাজন ছাত্রছাত্রীরাই আর্তমানবতার সেবায় অকুণ্ঠ চিত্তে এগিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক কালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি গঠন করে। এ ত্রাণ কমিটিকে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যে কেবল অর্থ প্রদান করেছে (পরিশিষ্ট-৫) তাই নয়, ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর পরিমাণ নতুন ও পুরাতন কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান ছাড়াও ৯২ হাজার প্যাকেট ওআরএস তৈরি করেছে এবং দু'সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন হলে প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ হাজার করে রুটি তৈরি করেছে।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় তহবিলে ছাত্রছাত্রীদের দানের সব থেকে বেশি অংকের পরিমাণ এসেছিল ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। আমরা ল্যাবরেটরী স্কুলের দাতা এই ফুলকুঁড়িগুলো প্রস্ফুটিত হোক, তাদের জীবন সুন্দর হোক, মহৎ হোক সেই কামনা করছি এবং তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রকল্পে পালাক্রমে ১৫ দিন ধরে প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছে। আমি তাদের এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর এবং সমিতির দানে এ ত্রাণ তহবিল গড়ে উঠেছে তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আমরা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের আর্থিক দীনতার ফলে পদ সৃষ্টি, নতুন বিভাগ বা গবেষণা কেন্দ্র খোলা ইত্যাদি সম্পর্কে নানান বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যেমন :-

(ক) ব-দ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে যাতে এ কেন্দ্রটি তার কাজ আরম্ভ করতে পারে।

(খ) পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ডায়াটেটিকস-এ এম,এস-সি কোর্স খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা আগামী শিক্ষা বছরে চালু হবে।

(গ) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সাবসিডিয়ারি পর্যায়ে ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে, যা আগামী শিক্ষা বছর থেকে চালু হবে।

(ঘ) কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এটিও আগামী বছর আমরা চালু করতে পারব বলে আশা করি।

(ঙ) ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে বিবিএ কোর্স চালুর জন্য যে স্ট্যাটিউটের সংশোধন প্রয়োজন তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(চ) নজরুল গবেষণা কেন্দ্রকে সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক রূপ দেয়ার জন্য একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি শীঘ্রই এটির কার্যক্রম আমরা আরম্ভ করতে পারব।

এদিকে রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র, আরবি গবেষণা কেন্দ্র ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছে। এগুলোর কার্যক্রম আরম্ভ করতে আমরা কখন পারব জানি না; তবে এগুলোকে কার্যকর রূপ দেয়ার আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে আমরা মনে করি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি গড়ে উঠেছে,

তাকে কাজে লাগানো দরকার এবং আমি মনে করি দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বায়োটেকনোলজি গবেষণা কেন্দ্র এবং শক্তি গবেষণা কেন্দ্রকে গবেষণার ক্ষেত্রে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের মতো নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগ, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকস বিভাগ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ প্রভৃতি ছোট ছোট বিভাগগুলোকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

সাধ আমাদের অনেক, কিন্তু সাধ্য আমাদের খুবই সীমিত। আর তাই কখন, কিভাবে আমাদের সাধ পূর্ণ হবে তা আমরা জানি না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি সকলে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিকার ভালোবাসি, আমাদের যদি দেশপ্রেম থাকে এবং আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে সকলে একযোগে কাজ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হবে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আমি ১৯৯০-৯১ সালের সালতামামী দিয়েছি। আপনাদের বিচার-বিবেচনা ও আলাপ-আলোচনার এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কে সুপারিশ দেয়ার জন্য এটি উপস্থাপন করা হলো।

ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে উপাচার্যের ভাষণ, ১৯৯২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ১৯৯১-৯২ শিক্ষা বছরের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে স্বাগত জানাচ্ছি। সিনেটের এই বার্ষিক অধিবেশন আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। কেননা, এ উপলক্ষে আমরা যে কেবল একে অপরের সাথে মিলিত হতে পেরে আনন্দিত হই তাই নয়, এ অধিবেশনে আমাদের অর্জন এবং ব্যর্থতা সবকিছুই খোলাখুলি আলোচিত হয়। আর তাই আপনারা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক না-জানা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন, আমরাও তেমনি আপনাদের সাথে মতামত বিনিময় করতে পেরে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত পেয়ে উপকৃত হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসক হিসাবে অন্তত আমি তাই অনেক আগ্রহ নিয়ে এ দিনটির অপেক্ষায় থাকি। তবে একই সাথে বলতে হয় যে, এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের জন্য যে সময়, শ্রম ও চিন্তা দেয়া প্রয়োজন তা, আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, আমরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও সব সময় দিতে পারি না। এর কারণ আমাদের কোনো সদিচ্ছার অভাব নয় বরং যে বৈরী পরিবেশে আমাদের কর্ম সম্পাদন করতে হচ্ছে তা তারই ফল।

আর তাই মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আমি প্রথমেই যে বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছি তা গত এক বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কতগুলি দিক। গত বছরে আমি আমার সিনেট বক্তৃতায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে এ ক্যাম্পাসে মৃত ব্যক্তিদের যে সংখ্যা দিয়েছিলাম অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের গত বারো মাসের চিত্র তার সম্পূর্ণ উল্টো। আলোচ্য বছরে ক্যাম্পাসে কত ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমার স্বল্প পরিসর সিনেটের বার্ষিক বক্তৃতায় দেয়া সম্ভব নয়। তবে গত এক বছরে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষের ফলে অথবা তার সাথে যুক্ত অন্য কোনো কার্যকলাপের ফলে যে ক'জন ছাত্র/অছাত্র প্রাক্তন ছাত্র অথবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এখানে মৃত্যুবরণ করেছেন তার সংখ্যা, ১৯৭৪ সালে মোহসীন হলে সংঘটিত একটি ছাত্র সংগঠনের অন্তর্কলহের ফলে যে সাতজন ছাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই ঘটনাকে বাদ দিলে অতীতের সব রেকর্ড

ছাড়িয়ে গেছে। একমাত্র গত ২৭শে অক্টোবর দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শফিকুল ইসলাম লিটন, ভূতত্ত্ব বিভাগের মিজানুর রহমান মিজান, ঢাকা কলেজের মির্জা গালিবুর রহমান ও একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ৯ই জানুয়ারি মনিরুজ্জামান বাদল নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্রের লাশ জগন্নাথ হলের গৃহ শিক্ষকদের বাস-ভবনের নিকট পাওয়া যায়। গত ১৩ই মার্চ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের আরেকজন ছাত্র মোঃ মঈন হোসেন রাজু সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল করার সময় দুটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের গোলাগুলির সময় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ছাড়া সূর্যসেন হলের উত্তর দিকের রাস্তার কয়েক মাস আগে একজন নাম না জানা ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং গত ২৪শে জুন রাতে জহুরুল হক হলের টি.ভি. কক্ষে একজন বহিরাগত ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এই মৃত্যুগুলোর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তা সবসময়েই রাজনৈতিক। দেশীয় রাজনীতিতে দুটি দলের অথবা সংগঠনের দ্বন্দ্ব বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি দল বা সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এগুলোর পিছনে কাজ করছে। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে এরা তাদের রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সমাধা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। এসব বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলবদের সূতোর টান আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। অথচ যাঁরা এদের ব্যবহার করছেন তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে বসে আরাম-আয়েশে দিনযাপন করছেন।

বিগত এক বছরে ছাত্র সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্বে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে; তা হচ্ছে হল দখলের প্রক্রিয়া। কোনো কোনো দল বা সংগঠনের খুব সম্ভবত এরূপ একটি ধারণা হয়েছে যে, হল দখল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাকসু এবং হল সংসদগুলোর নির্বাচনে জয়লাভ করা যাবে যা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এ ধরনের কার্যক্রমের আরম্ভ। ১৯৯১ সালের ১৭ই মার্চ দিবাগত রাতে বসুনিয়া তোরণ এবং দেলোয়ার তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাধ্যমে হল দখলের প্রক্রিয়ার যে সূচনা হয় তা এখনো থামেনি। এর ফলে এখন নীলক্ষেত রোডের উত্তরের এবং দক্ষিণের হলগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে এক বা অপর সংগঠনের দখলে রয়েছে। এই হল দখল প্রক্রিয়ায় যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তার কাছে হল প্রশাসন বলা যেতে পারে জিম্মি। তাই বহু চেষ্টা করেও হল প্রশাসন হল থেকে বহিরাগত বা অস্ত্রধারীদের

বের করে দিতে অথবা প্রতিটি হলে প্রকৃত আসনপ্রাপ্ত ছাত্রকে তার আসনের দখল দিতে সবসময় সক্ষম হচ্ছেন না। হল প্রশাসনের চেষ্টা মাঝে মাঝে কিছুটা ফলদায়ক হলেও তা অত্যন্ত প্রান্তিক এবং স্বল্পস্থায়ী।

মাননীয় সদস্যা/সদস্যাবৃন্দ,

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ছাড়াও সন্ত্রাসের আরেকটি দিক আছে, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয় আবাসিক হলগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে কিছু দুষ্কৃতিকারী অবস্থান করে এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে তারা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। যার ফলে একদিকে আমাদের নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয়, অপরদিকে এ অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে কোনো কোনো সময় তা গোলাগুলি পর্যায়ে চলে যায় এবং ছাত্র/অছাত্র বা অন্য কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সমস্ত ঘটনার যারা নায়ক তারা শক্তিশালী মহল, দল অথবা সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে তাদের এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে অথবা এসব সংগঠন বা দলের নাম ব্যবহার করছে। এ ঘটনা এ ক্যাম্পাসে নতুন নয়। কিন্তু তা বাড়তে বাড়তে এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সব সময়ই ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী সকলের নিরাপত্তার জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি উপাচার্য হয়ে আসার পর এ নির্মাণ কার্যগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে সমাধা হয় তার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পদক্ষেপই স্থায়ী সমাধান দিচ্ছে না। বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলি।

যেহেতু নির্মাণ কার্যগুলোর অর্থের বখরা নিয়ে টেণ্ডার গ্রহণের সময় অথবা তার পরবর্তী পর্যায়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্মাণ কার্য ব্যাহত হয় অথবা গোলাগুলির ঘটনা ঘটে তাই এসব কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে না করে পি.ডব্লিও.ডি-এর মাধ্যমে করার একটি সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটে গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যখন জানতে পারি যে, পি.ডব্লিও.ডি. আমাদের কাজগুলো করে দিলে প্রতিটি কাজের মূল্যায়নের উপর ১৭.৫০% ভাগ অর্থ বাড়তি প্রদান করতে হবে তখন আমরা পুনরায় আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হই, কেননা, এ অর্থের কোনো সংস্থান আমাদের নেই এবং পরিকল্পনা কমিশনও তা দিতে সম্মত নয়। অস্ত্র প্রদর্শনের কারণে যাতে প্রকৃত নির্মাণকারী ঠিকাদার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে টেণ্ডার দিতে বাধাপ্রাপ্ত না হন সেজন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সেক্রেটারিয়েটেও টেণ্ডার নেয়ার ব্যবস্থা করি। ২/১টি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা ফলদায়ী হয়েছে। কিন্তু এখানেও বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা শিক্ষকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত সোয়া দুই কোটি টাকার একটি বিশেষ মঞ্জুরী পাই।

এর সাথে আমাদের নিজেদের কিছু সম্পদ যুক্ত করে আগামী এক বছরের মধ্যে যাতে অন্তত ৭০টি শিক্ষক-অফিসারদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যায় এ উদ্দেশ্যে স্থাপত্য নকশা, মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রাথমিক কাজগুলো করে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। আমরা লক্ষ করছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত ঠিকাদার নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁরা বহুদিন যাবত এখানে কাজগুলো করছেন। তার ফলে তাদের একটি কায়েমী স্বার্থ এখানে রয়ে গেছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো কাজই সমাধা করছেন না। এই বৃত্তটি ভাঙ্গার জন্য নতুন বাসভবনগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে টেণ্ডার আহ্বান করার সময় আমরা কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেই। যেমন ঠিকাদারদের অন্তত তিন কোটি টাকার কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এর প্রমাণ দাখিল করতে হবে এবং এক বছরের সেই ঠিকাদারের ব্যাংকের লেনদেনের হিসাব দিতে হবে। আমরা তারপরই কেবল টেণ্ডার সিডিউল বন্টন করেছি। স্বভাবতই এর ফলে যে সমস্ত ঠিকাদার আমাদের কাছ থেকে সিডিউল নিয়ে গিয়েছেন তারা সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্ম। কিন্তু গত ২৪ তারিখ অর্থাৎ যেদিন টেণ্ডার দেয়ার শেষ দিন ছিল সেদিন দেখা গেল একটি টেণ্ডারও বিশ্ববিদ্যালয় বা সেক্রেটারিয়েটের বাক্সে পড়েনি। কেমন করে এরূপ অভিনব ঘটনা ঘটল তা আমরা এখনো স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। তবে একজন ঠিকাদারের কাছ থেকে এমন খবর পাওয়া গেছে যে দুই দল তরুণ আলাদা আলাদাভাবে তাঁর বাসায় গিয়ে এ ধরনের ভীতি প্রদর্শন করে এসেছে যে, তাঁদেরকে অন্তত ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা না দিলে টেণ্ডার ফেলতে দেয়া হবে না। আমাদের ধারণা, অন্যান্য সিডিউল ক্রেতার নিকটও এ ধরনের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যার ফলে একটি টেণ্ডারও আমরা পাইনি। এই হচ্ছে আমাদের সন্ত্রাসের আরেক রূপ।

বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় টেলিফোনের বিষয়টি এখানে আর উল্লেখ করা হচ্ছে না।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

অব্যাহত সন্ত্রাস আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে সবসময়। গত বছর ২০শে জুন দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে মাহবুবুর রহমান নামে একজন ছাত্র মৃত্যুবরণ করে, ফলে ঐ দিন সিনেট সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি এবং আপনারা অবহিত আছেন যে, সিনেটের স্থগিত সভাটি আমরা এ বছর জানুয়ারি মাসে করি। এদিকে ২০শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত যদিও বিশ্ববিদ্যালয় ঈদ উপলক্ষে ছুটি ছিল কিন্তু তারপরেও আরো পাঁচ দিন এই ছুটি বর্ধিত করা হয়। কেননা বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটির মধ্যে একটি আপাতত সমঝোতা না এনে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা

সম্ভব ছিল না। এদিকে ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুনরায় জুলাই মাসের শেষার্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ভয়ংকর রূপ লাভ করে। ঐ সময়ে প্রক্টরের পুত্রকে প্রহার, ২২শে জুলাই তারিখে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে ভাংচুর, শামসুন্নাহার হলের সম্মুখে গুলি ও বোমা বর্ষণ, ৩০ তারিখ পুনরায় উপাচার্যের সেক্রেটারির অফিসে ভাংচুর, প্রভোস্ট, শিক্ষক, অফিসারদের বাসায় ও ছাত্রীদের হলে অস্ত্রধারীদের ও মিছিলকারীদের প্রবেশ ও ভীতি প্রদর্শন, বিডিআর-এর গাড়ির উপর আক্রমণ এবং সর্বোপরি দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তিন ঘণ্টা ব্যাপী গোলাগুলি বিনিময়ের প্রেক্ষাপটে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হলে ৩১শে জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ৪৮ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে অব্যাহত সন্ত্রাসের মুখে ৮ই নভেম্বর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে শিক্ষকগণ কর্মবিরতি পালন করেন যা ২৯ দিন ব্যাপী চলে। সম্প্রতি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষককে একটি ছাত্র দৈহিকভাবে আক্রমণ করলে শিক্ষক সমিতি ৬ থেকে ২৪শে জুন পর্যন্ত পুনরায় কর্মবিরতি পালন করেন, যদিও এ সময়ে দশ দিন ঈদুল আযহার জন্য বন্ধ ছিল।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এ ধরনের অনির্ধারিত বন্ধ আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের মাঝে মাঝে ব্যাহত তো করছেই উপরন্তু শিক্ষা বছরের অনিশ্চয়তার জন্য সেশন জ্যামের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা কোনো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে পারছি না। অবশ্য সেশন জ্যাম যে সম্পূর্ণটুকুই বহিরারোপিত কারণে হচ্ছে তাও আমি স্বীকার করি না। ডীন ও চেয়ারম্যানদের সাথে বিভিন্ন সময়ে যখন এ বিষয়ে আমি আলোচনা করি তখন তাঁদের বার বার এ বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছি যে, সেশন জ্যামের জন্য যে সমস্ত কারণের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তা বিবেচনায় এনে কোনো ফল পাওয়া যাবে না, বরং যে কারণগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা আমাদের করা প্রয়োজন। আর সে জন্যই আমি বহুবার এ কথা বলার চেষ্টা করেছি যে, একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিটি পর্ব সংকোচন করা প্রয়োজন, যেমন ভর্তি পর্ব, শিক্ষাদান কার্যক্রম পর্ব, পরীক্ষা গ্রহণ পর্ব এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এই ধারণা থেকে আমি ডীন ও চেয়ারম্যানদের বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম সমাধা করা, পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ, ফল প্রকাশের তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করছি যে, যদিও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারিখগুলো নির্ধারণ করা হয়, তবুও পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এগুলি

সবসময় মেনে চলা হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়ে আমার একটি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং একটি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পত্র আমাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে। ঘটনাটি একটু খুলে বলি।

গত বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-এর মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশসমূহ বন্ধ থাকলেও অনেকগুলো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের একটি স্থায়ী নির্দেশ ছিল যে, একটি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী শ্রেণীর পাঠদান আরম্ভ করতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমি জানলাম যে, কোনো বিভাগেই এটা পালিত হয়নি। তখন ডীন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের একটি সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, ফেব্রুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ থেকে কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদদ্বয়ের বিভাগসমূহে মাস্টার্স শেষ পর্বের ক্লাশ আরম্ভ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বিভাগে প্রচারিত হওয়ার পর দুটি বিভাগের চেয়ারম্যান লিখিতভাবে জানালেন যে, তাঁদের বিভাগে তাঁরা ক্লাশ আরম্ভ করবেন না। কারণ হিসেবে তাঁরা দেখালেন যে, পূর্ববর্তী বছরের শেষ পর্ব মাস্টার্সের ক্লাশ তখনও চলছে। পুনরায় তাঁদেরকে জানানো হলো যে, যদি শিক্ষকের অথবা শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা থাকে তাহলেই কেবলমাত্র ক্লাশ আরম্ভ না করার যুক্তি আসতে পারে, অন্য কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এর উত্তরে একজন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অত্যন্ত কড়াসুরে আমাদের জানালেন যে, ক্লাশ নেয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির। অতএব এ ধরনের চিঠি যেন ভবিষ্যতে তাঁকে আর না লেখা হয়। আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, চেয়ারম্যান মহোদয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন, বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির এখতিয়ার এবং একজন শিক্ষকের Academic Freedom এগুলোর মধ্যে কোনোটির সীমারেখা কোথায় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। আমরা প্রতিটি শিক্ষকের "একাডেমিক ফ্রিডম"-এর নীতিতে অবিচল বিশ্বাসী এবং বিভাগীয় শিক্ষা ও গবেষণা পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার প্রশ্ন তোলার কথা উঠে না। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, সকলে মিলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমরা একটি সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছি এবং একটি বিভাগ যথোপযুক্ত কারণ ছাড়াই তার বিরোধিতা করবে? আমি বিশ্বাস করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন এরূপ চিন্তাধারা কেবল বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করবে, যা আদৌ কাম্য নয়।

অনির্ধারিত বন্ধ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসমূহ এবং কিছুসংখ্যক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একসাথে ভর্তি পরীক্ষা না হওয়ার জন্য যে বিলম্ব হচ্ছে—এ দুটি কারণই বহিরারোপিত কারণের মধ্যে প্রধান। কিন্তু অভ্যন্তরীণ

কারণ যে একেবারে নেই এ কথা বলা যাবে না। ছয় মাসে অনেক পরীক্ষার ফল বেরোয় না সে দোষ কি ছাত্রদের? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্ভব হয় না সে দোষ কার? পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর তাড়াহুড়া করে কোর্স শেষ করার প্রবণতা এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবি কেন আসছে বার বার তাও আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে যার যা দায়িত্ব আছে তা স্বীকার করে এর সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কোনো পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আমি এতক্ষণ যেসব কথা বলেছি তাতে এ ধরনের একটি ধারণা হয়তো হতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সবই বুঝি এখন অমাবস্যার রাত্রির মতো তমশাচ্ছন্ন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ততো নৈরাশ্যজনক নয়। অনেক বাধা-বিপত্তি, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এখানে লেখাপড়া হচ্ছে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, শিক্ষকগণ দেশ-বিদেশে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করছেন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি লাভ করছেন এগুলি আমাদের গর্বের বিষয়, আমাদের অর্জন। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষা কার্যক্রম সবসময় চালু থাকে এ বিষয়ে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। আর তাই অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গত ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত ছুটি ও শিক্ষকদের কয়েক দিন সাম্প্রতিক কর্মবিরতি ছাড়া ক্লাশসমূহ চালু রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে এ বছর কেন্দ্রীয়ভাবে অথবা বিভিন্ন বিভাগ বা ইনষ্টিটিউটে নিম্নে উল্লেখিত বক্তৃতা মালা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ঃ

(১) গত ২রা ও ৩রা মার্চ অধ্যাপক আহমদ শরীফ কবি মতিয়ুর রহমান স্মারক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল "সংস্কৃতি"।

(২) ১৮-১১-৯১ তারিখে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান "জাতির আত্ম নির্ভরতার প্রশ্ন" শীর্ষক নাজমা জেসমিন চৌধুরী ২য় স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৩) ২৮-১-৯২ থেকে ৩০-১-৯২ পর্যন্ত আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত ৩ দিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ১৯৯১-এর ডিসেম্বর "শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস" সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মতামত ভিত্তিক ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ভূগোল বিভাগ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে বিভিন্ন সেমিনার অথবা প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উপরোক্ত বক্তৃতামালা/সেমিনার ছাড়াও যে সমস্ত বিদ্যৎ সংঘের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জড়িত সেগুলোর উদ্যোগে যেসব জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উৎসাহিত করার জন্য এগুলোকে অর্থ সাহায্য করেছে (সংযোজনী-১)। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ২১০ জন শিক্ষক বিদেশে বিভিন্ন কনফারেন্সে বা সেমিনারে যোগদান করেছেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের যাতায়াত ভাড়া পুরোপুরি আমন্ত্রণকারীদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদের মধ্যেও কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে (সংযোজনী-২)। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষকদের দশ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে, আরো তিন খানি বই প্রেসে রয়েছে এবং ছয় খানি প্রেসে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের প্রকাশক কর্তৃক অবশ্য শিক্ষকদের অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

এ বছর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদ-উল-আমিন বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্স কর্তৃক সোনালী ব্যাংক স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন, একই বিভাগের অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেছেন ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মওলানা আকরাম খাঁ স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

মাননীয় সিনেট সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

যদিও সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের লোকের কাছে প্রায় একটি নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিণত হচ্ছে তবু এ বছরেও আমরা অন্তত বিভিন্ন অংকের ৬টি ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য অনুদান পেয়েছি (সংযোজনী-৩)।

যে সব সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের এসব অনুদান দিয়েছেন আমরা তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বাস অনুদান হিসেবে আমাদের দিয়েছেন। এ জন্য আমরা মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

বিদেশী দূতাবাস বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে আমাদের এ বছরের যোগাযোগও উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এগুলি উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) গত ৫ই মার্চ প্যারিসের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন-এর সাথে একটি ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিক্ষক, গবেষক এবং প্রকাশনা বিনিময়ের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তির অধীনে ইতিমধ্যেই উক্ত ইনস্টিটিউট আমাদের একজন অধ্যাপক এবং আরেকজন তরুণ শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন।

(২) মার্চ মাসে ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর সাথে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের আরেকটি চুক্তি সম্পাদনা করা হয়েছে। এ চুক্তির অধীনে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ আমাদের প্রয়োজনবোধে ভাষা ইনস্টিটিউটে ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাহায্য দিবে।

(৩) পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাথে নরওয়ের বারগেন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কে আরেকটি চুক্তি সম্পাদনের শেষ পর্যায়ে আছে।

(৪) বারগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রাণিবিদ্যা বিভাগেরও গবেষণার ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

(৫) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম শীর্ষক একটি যৌথ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা আগামী দুই বছর ব্যাপী চলবে।

(৬) গত মার্চ মাসে বাংলাদেশ সফররত বেলজিয়ামের আর্থ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের রেক্টরের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক পরামর্শদাতা প্রফেসর পাপ এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় শিক্ষক, গবেষক এবং প্রকাশনা আদান-প্রদানসহ শিক্ষা ও গবেষণা সহায়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে প্রোগ্রাম ভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে নিযুক্ত ইটালিয়ান রাষ্ট্রদূত একজন ইটালির শিক্ষকের, মার্কিন সরকার একজন টিচিং ফেলো, চীনা সরকার একজন চীনা শিক্ষক, ফরাসি সরকার একজন ফরাসি শিক্ষক এবং জাপান ফাউন্ডেশন একজন জাপানি শিক্ষক আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে নিয়োগদান করেছেন। এদিকে দিল্লিতে অবস্থানরত চিলির মাননীয় রাষ্ট্রদূত, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত এবং স্পেনের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় তাঁদের দেশের পক্ষ থেকে আধুনিক ভাষা

ইনস্টিটিউটে স্পেনিস ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে বাংলাদেশে নিয়োজিত মাননীয় তুর্কী রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তুরস্ক ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য একটি বৃত্তি ইনস্টিটিউটকে প্রদান করেছেন।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,
সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এ কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু তারপরেও এ বছর আমাদের নবলব্ধ পুরাতন জাদুঘরটি (বর্তমানে আনোয়ার পাশা ভবন) তরুণ শিক্ষকদের বাসভবনে রূপান্তর করণের কাজ এবং প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের তৃতীয় তলা নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ঈশা খাঁ ও দক্ষিণ ফুলার রোডে ১০টি করে ২০টি শিক্ষক-অফিসারদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ২০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজগুলিও সমাপ্তির পথে। বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের বাসভবন নির্মাণ, মোকাররম হোসেন খোন্দকার বিজ্ঞান ভবনের তৃতীয়তলা নির্মাণের কাজও শীঘ্র শেষ হবে বলে আমরা আশা করছি।

উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের একটি বিবরণ পরিশিষ্টে (সংযোজনী-৪) দেখা যেতে পারে। এদিকে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ও আধুনিকীকরণের কিছু কিছু কার্যক্রম ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। রেজিস্ট্রারের দফতরের কাঠামো পুনর্বিন্যাসসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পুনর্নির্ধারিত হয়েছে—যাতে এ কার্যালয়টি দ্রুত গতিতে কাজ করতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে আধুনিকায়নের কার্যক্রম হিসাবে উপাচার্যের, রেজিস্ট্রার এবং হিসাব পরিচালকের দফতরে পি, সি, স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে—যাতে এ অফিসগুলি আরো গতিশীল হতে পারে এবং তাদের সেবার মান উন্নত হতে পারে। একটি ফ্যাক্স মেশিন স্থাপনের জন্যও টি.অ্যান্ড.টি.কে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি শীঘ্র এটি স্থাপন করা হবে।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,
যদিও আমাদের বাৎসরিক বাজেটে অর্থের সংকুলান অত্যন্ত অপ্রতুল কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে চিত্রটি অন্য রকম। আমি গত দুই বছর যাবত লক্ষ করে আসছি যে, আমরা যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করি প্রায় কোনো সময়েই সেগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এ ব্যবস্থাও বহুদিনের অব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক শ্লথতার ফল। অনেক কিছু দেখেশুনে আমার একটি ধারণা জন্মেছে

যে, কোনো কোনো মহলের অশুভ আঁতাতের ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারছি না। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের সামগ্রিক তদারকির জন্য শিক্ষকদের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছে। অবশ্য এ দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে। আমরা আশা করি এর ফলে আমাদের উন্নয়ন কাজগুলো ত্বরান্বিত হবে।

আপনারা আরো লক্ষ করবেন যে, বাজেটে আমাদের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নতুন টেলিফোন সংযোগের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্তত প্রথম পর্যায়ে সকল অধ্যাপকের অফিস কক্ষে পিএবিএক্স লাইনের সংযোগ দেয়া। যে টেলিফোন সংযোগদানের কথা আমরা ভেবেছি তা যাতে সর্বাধুনিক হয় সেজন্য আমরা বিষয়টি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি।

গত বছর আমার সিনেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, আমাদের গ্রন্থাগারটি আধুনিকীকরণের জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের সাথে কথাবার্তা চলছে। এশিয়া ফাউন্ডেশনে অনেকদিন যাবত তাদের ঢাকাস্থ প্রতিনিধির অনুপস্থিতির কারণে এবং আমাদের পূর্ণকালীণ গ্রন্থাগারিক না থাকায় এশিয়া ফাউন্ডেশনের অনাগ্রহের কারণে আলোচ্য বিষয়ে আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারিনি। তবে আমাদের নিজেদের সীমিত সম্পদ থেকে গ্রন্থাগার আধুনিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ওখানে দুটি পারসোনাল কম্পিউটার স্থাপনের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের উপরে আরেকটি তলা নির্মাণেরও প্রাথমিক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ঢাকায় এসেছেন এবং আমরা আশা করছি যে, তাঁদের সাথে পুনঃ যোগাযোগ করে আমরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারব।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে এবং মহলে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। বিষয়টি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত। দেশের জনসংখ্যা যতটা বেড়েছে সে তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি। তাছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা অনেক ছাত্রছাত্রীর। আর তাই গত দুই দশক যাবত যে হারে আমাদের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলেছে সে হারে ভৌত সুযোগ-

সুবিধা বাড়েনি। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে কোনো কোনো মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমানে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮ (আটাশ) হাজার। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে আমার মনে হয় যে, এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আর বাড়তে দেয়া সমীচীন হবে না। এটি কোনো সিদ্ধান্ত নয়, এটি নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মত।

অবশ্য ইতিপূর্বে যে সব বিভাগ খোলার বা নতুন কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বেশ কিছুদিন পূর্বে কম্পিউটার বিজ্ঞান নামে একটি নতুন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এজন্য এ বছরের বাজেটে কিছু অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় দেশের স্বার্থে এ বিভাগটি অনতিবিলম্বে চালু হওয়া দরকার। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে বি.বি.এ. কোর্স প্রবর্তন সম্পর্কেও আমি একই মত পোষণ করি। এদিকে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ বাংলা বিভাগ থেকে পৃথক করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। অপরদিকে আমি এও বিশ্বাস করি যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন অনুকূল পরিবেশ পেলে তাদের সৃজনী শক্তি আরো বিকশিত হওয়া সম্ভব। এ কারণে আমাদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে গবেষণা কেন্দ্রগুলি শক্তিশালী করার একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আপনারা বাজেট দেখলে লক্ষ করবেন যে, বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রত্যেক বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর যারা প্রথম শ্রেণী পাবেন তাঁদের গবেষণা সহকারী হিসেবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করার জন্য বাজেটে প্রথমবারের মত ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা বাড়তি বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এটি আমাদের একটি নতুন পরিকল্পনা যা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে গবেষণার ক্ষেত্রে তা সুফলদায়ী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এতক্ষণ আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, আপনাদের সকলের প্রাণপ্রিয় এ শিক্ষায়তনকে প্রকৃত অর্থে একটি শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টার আমাদের কোনো ত্রুটি নেই, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারিনি। তবে সত্যি যদি এ

প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ থাকে তাহলে সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ এবং জ্ঞান সৃষ্টির একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। আমি সবসময় বিশ্বাস করি কোনো মহৎ কাজ একক ব্যক্তির চেষ্টায় সাধিত হতে পারে না। আর তাই আমি বরাবরের মতো আবারো ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এ প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্য ও তার গৌরব সমুন্নত রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে সবিনয় আহ্বান জানাব।

আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার "ঢাকা ডাইজেস্ট" পত্রিকার সাথে একটি একান্ত সাক্ষাতকার*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে যার খ্যাতি। দেশের সর্ব প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ ভাইস চ্যান্সেলর। প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা বর্তমানে এই পদে আসীন। আটাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় আজ নানারকম সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বজনিত সংঘাত হানাহানি যেমন আজ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অস্থির করে রেখেছে। পাশাপাশি রয়েছে নানারকম পারিপার্শ্বিক সমস্যা আর সকল সমস্যা ও সংকট প্রধানত যাকে মোকাবিলা করতে হয় তিনি ভাইস চ্যান্সেলর। এ পদ একাধারে সম্মানের আবার ঝুঁকিরও। ভাইস চ্যান্সেলরকে সামলাতে হয় একদিকে সরকারকে অন্যদিকে ছাত্র—শিক্ষক—কর্মচারীকে। আর ঐতিহাসিকভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবিভাজ্য অংশ বলে ভিসির দায়িত্ব পালনও তাই রীতিমত চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ এখন মোকাবিলা করছেন প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা।

ঢাকা ডাইজেস্ট এবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা একজন শিক্ষাবিদ হিসেবেও খ্যাত। দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সাথে জড়িত। ঢাকা ডাইজেস্ট প্রফেসর মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করেছে তার ব্যক্তিগত ও শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে। বের করার চেষ্টা করেছে তার ব্যক্তিগত ও শিক্ষকতা জীবন সম্পর্কে। বের করার চেষ্টা করেছে কিভাবে তিনি বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন।

---

* নভেম্বর, ১৯৯০-এ 'ঢাকা ডাইজেষ্ট' পত্রিকায় মুদ্রিত।

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১লা মে। ১৯৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এম এস সি ডিগ্রি লাভের পর জগন্নাথ কলেজে লেকচারার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। ঐ বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ শিক্ষকতাকালে তিনি ডীন সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সিন্ডিকেট ও সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত।

এই সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন ডাইজেস্ট সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু এবং দৈনিক সংগ্রামের সিটি এডিটর সালাহউদ্দিন বাবর। সিনিয়র রিপোর্টার আযম মীর ও স্টাফ রিপোর্টার ফখরুল আলম খান কাঞ্চন।

ঢাকা ডাইজেস্ট ঃ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়া একজন শিক্ষাবিদের অবশ্যই গৌরবের ব্যাপার। আপনি ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার পর আপনার যে অনুভূতি, তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর হিসেবে যে অনুভূতি ছিল, তার কোনো তারতম্য ঘটেছে কিনা? আপনি আগে সুখী মানুষ ছিলেন? না এখন আপনি সুখী।

মনিরুজ্জামন মিঞা ঃ এটা তো সত্য কথা যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদটি অত্যন্ত গৌরবান্বিত পদ। কিন্তু একজন অধ্যাপকেরও গৌরব আছে। ভিসির দায়িত্বটা বাড়তি। দায়িত্ব যদি কেউ সঠিকভাবে পালন করতে চান তাহলে এ ধরনের দায়িত্ব নিয়ে, একজন অধ্যাপকের তুলনায় বেশকিছু কাজ করার সুযোগ এসে যায়। সেটাই প্রধান। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা রয়েছে। যেগুলো কেবলমাত্র আমি যদি অধ্যাপক থাকতাম, তবে সেসব সমস্যার সমাধান করা আমার হয়ত খুব একটা সুযোগ হতো না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সেসব সমস্যা সমাধানের হয়ত একটা সুযোগ এসেছে। আর সেই হিসেবেই আমি দেখছি গোটা বিষয়টা। তা না হলে সাময়িক সুখ-শান্তির কথা যদি বলেন, তবে অধ্যাপক হিসেবেই বেশি সুখী ছিলাম। উপাচার্য হিসেবে আবার কিছু আনন্দ আছে। কিছু সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাওয়া গেছে, যে সমস্যাগুলো শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। তারও একটা আলাদা স্বাদ রয়েছে। বিশেষ করে আমার জন্য। কারণ আমি প্রশাসনে অনেক দিন ধরে জড়িত এবং এ সমস্যাগুলো আমার জানা। আমার নিজেরও কিছু চিন্তাধারা আছে। কিছু স্বপ্ন আছে বলতে পারেন এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে।

ঢা ডাঃ স্যার আপনি দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপক ছিলেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি ডীন ছিলেন। আপনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান ছিলেন। এসব দায়িত্ব পালন করার পর আপনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস চ্যান্সেলর। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আপনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করবেন, দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আপনার পরিকল্পনামত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা। যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে সেগুলো কি? আর যদি পদক্ষেপ নিতে না পেরে থাকেন, তারই বা কারণ কি?

ম মিঃ আমি এখনি আমার সব পরিকল্পনা বলতে চাচ্ছিনা। তবুও কিছু আভাস দিতে পারি। তা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব সমস্যা দেখা গিয়েছে, সেই সমস্যাগুলোই প্রধান। যেমন সন্ত্রাস এবং তার সাথে সম্পর্কিত সেশন জট। এগুলো সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব পরিকল্পনা আছে এবং আমি এর মাঝে কিছু কিছু বলেছি। যেহেতু সন্ত্রাসের সাথে সেশন জট সমস্যাটা জড়িত, সেহেতু সন্ত্রাস সম্পর্কে আমি এখন আরো বেশি বুঝতে পারছি। কেবল মাত্র প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করে, অর্থাৎ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পক্ষে এই সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। এর কারণ, সন্ত্রাস বহিরারোপিত। অতএব যেখান থেকে সন্ত্রাস আসছে বা যাদের মাধ্যমে আসছে, তারা যদি সচেতন না হন, তারা যদি দেশের স্বার্থে উদ্যোগী না হন, তাহলে এই সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। এছাড়াও প্রশ্ন রয়েছে। সরকারের বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা ভূমিকা আছে। তারাও আন্তরিকভাবে সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা করলে তা দমন হবে। তবুও আমি মনে করি যে, যারা সন্ত্রাস করছে, তারা কোনো-না-কোনো দল বা সংগঠনের ছত্রছায়ায় রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই সব দল বা সংগঠনগুলো এদেরকে কিন্তু DISOWN করছে না এদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা বা তাদেরকে নিজেদের লোক নয়-একথা বললেও সন্ত্রাস হয়ত দমন হতে পারতো। এরা কোথাও আশ্রয় পেলে তো সন্ত্রাস রয়েই যাবে। আর যেহেতু সমস্যাটা বেশ কিছুদিনের তাই এখন সমস্যাটা, বলা যেতে পারে বেশ জটিল হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা দেখছি, যে সম্পর্কে আগে আমি সামান্য জানতাম যে, সন্ত্রাসের আরেকটি কারণ কিন্তু ভেতরে। তা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ বলুন আর সংস্কারই বলুন তার সাথেও সন্ত্রাস জড়িত। এই সন্ত্রাসীরা এসব কাজ বাগাবার চেষ্টা করেছে বিগত দিনে। আজও সে অভ্যাস ছাড়তে পারছেনা। আমি অবশ্য আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভব, যেমন-উন্নয়নমূলক কাজ যেটা, সেটা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হবেনা। এই সিদ্ধান্ত আমি সিন্ডিকেট থেকে নিয়েছি। তবুও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার এতগুলো ভবন রয়েছে। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এর মেরামত কাজের প্রয়োজন। মেরামত কাজ বাইরে দেয়া যাবে না। কারণ এটা সার্বক্ষণিক কাজ। কিন্তু সেখানেও সন্ত্রাস। এগুলোর

জন্য সন্ত্রাস জিইয়ে রয়েছে। আমি এ সম্পর্কে এতটা জানতাম না। এই রকম ভেতরেও কিছু রয়েছে।

আর সেশন জটের কথা যদি বলেন, তো সে সম্পর্কেও কিছু পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। তবে বিস্তারিত পরিকল্পনা আমরা সামনে নিচ্ছি। আলাপ আলোচনা চলছে। সমস্যা আরো রয়েছে-এটা তো দেশের সব থেকে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরনো দিনের ঐতিহ্য নিয়ে, পুরনো দিনের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এখানে যে লাইব্রেরি রয়েছে, তাতে বই এর সংখ্যা যদিও প্রচুর, কিন্তু রিডার্স সার্ভিস আদৌ আধুনিক নয়। কোনো বই খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। শিক্ষকদের পক্ষেই মুশকিল, ছাত্রদের পক্ষে তো বটেই। ছাত্ররা সব সময় বলে বই নেই, বই নেই। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। রিডার্স সার্ভিসটা খুব পুওর। এটা আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। এগুলো সমস্যাও রয়েছে।

একাডেমিক দিকে বলতে গেলে বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোতে এমনকি ক্লাসে পড়ানোর জন্য যেমন যন্ত্রপাতি দরকার, তা এত বেশি ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে যে, আমাদের নিজেদের সম্পদের মধ্যে আমরা তা জোগড় করতে পারছি না। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রায় একাহাজার শিক্ষক রয়েছে। তাদের যে সব ভৌত সুযোগ সুবিধা যেমন—বাসগৃহ, পরিবহন, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি অত্যন্ত অপ্রতুল। এইসব বিভিন্ন সমস্যাজর্জরিত আমরা। এগুলো চিন্তা ভাবনা করছি আমি। আমার পরিকল্পনা আছে। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলাপ আলোচনা করছি। যখন কিছুটা Shape নেবে, হয়ত বলবো আমি এ সম্পর্কে।

ঢা ডাঃ আমাদের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলরদের ছবি দেখছি। এরা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়। আপনি আপাতত সেই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে। প্রত্যেক ভিসির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য জড়িত। আপনি কি মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত ঐতিহ্য ধারণ করতে পারছে?

ম মিঃ এমনিতেই সাধারণভাবে একটা ধারণা হয়েছে জনমনে যে, ঐতিহ্য বোধ হয় অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। এই ধারণাটা আসলে কিন্তু এসেছে, প্রধানত ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস থেকে। সন্ত্রাস ও সেশন জ্যাম থেকে। অনেকে মনে করছেন যে, এখানে লেখাপড়া হচ্ছে না। এর ঐতিহ্য নেই। আমি কিন্তু ঠিক ততটা মনে করছিনা। আমি মনে করি, অতীতের ব্যক্তিরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, এখনো সেই ঐতিহ্য চালু আছে। তবে শিক্ষক যারা আগে ছিলেন, তারা সংখ্যায় ছিলেন অত্যন্ত অল্প। এখন শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। তার জন্যই শিক্ষকদের অর্জন বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে, খুব একটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আগে

অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন তো। সবাই জানতে পারতেন, কি হচ্ছে, না হচ্ছে। এখন বহুসংখ্যক শিক্ষক। আমি মনে করি এঁরা ঐতিহ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ভালোভাবেই। কিন্তু জনমনে একটা ধারণা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে যায় সন্ত্রাসের কারণে এইসব দেখে। অন্য আরেকটা কারণ অবশ্য বলা চলে যে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যতটা সুষ্ঠুভাবে চলা দরকার এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার, সবটা হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারছে না।

ঢা ডাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সময় ছিল যখন একজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য অহংকার করতে পারতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পেরে একজন গর্ববোধ করতেন। এখন এখানে শিক্ষার মান, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ছাত্রদের মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদি সব মিলিয়ে আজকের পরিবেশের মূল্যায়ন কিভাবে করেন?

ম মিঃ হ্যাঁ, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন যাত্রা আরম্ভ করে তখন তার ছাত্র সংখ্যা ছিল আটশ। আজকে আটাশ হাজার। তারপরে সেই সময়টা ছিল একটা ঔপনিবেশিক আমল। পরে দেশ বলা যেতে পারে দুইবার স্বাধীন হয়েছে। সেই অর্থে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। এ রকম পরিবর্তনশীল জগতে, পরিবর্তনের সাথে জিনিষটাকে মিলিয়ে দেখতে হবে। ঐতিহ্য স্ট্যাটিক কিছু না। স্থানু কিছু না। ঐতিহ্য নিশ্চয়ই গৌরবের। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, একসময় যা ছিল, তা চিরকাল থাকবে। তা তো নয়। অতএব আজকেও আমি মনে করি যে, আজকের শিক্ষক ও ছাত্ররাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্র হতে পারলে গৌরবান্বিত মনে করেন।

ঢা ডাঃ স্যার আপনি বলেছেন সন্ত্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় সমস্যা এবং এই সন্ত্রাসটা আরোপিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের নয়। এর সাথে প্রশাসন অর্থাৎ সরকার, রাজনৈতিক দল এরা সবাই INVOLVED। তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিভাবে এই সন্ত্রাসের মোকাবিলা করবে এবং এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনা কি?

ম মিঃ মুশকিল হয়েছে কি জানেন, সময়টা এমন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে থেকে সমস্ত কথা বলা যায়না। যদিও সবকথাই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। যেমন আপনি বললেন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কথা। আসলে প্রত্যেকটি

ছাত্রসংগঠন তো কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। কিন্তু এই ছাত্র সংগঠনগুলো সংযত থাকুক বা সন্ত্রাস না করুক কিংবা সন্ত্রাসী হলে দল থেকে বের করে দেয়া হোক-এধরনের পদক্ষেপ কি কোনো রাজনৈতিক দল গ্রহণ করেছে? আমি দুঃখজনকভাবে লক্ষ করছি যে, সেটা কেউ করেননি। কিন্তু আমি যদি রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষারোপ করি, তাহলে তো আমার সম্পর্কে নানারকম কথাবার্তা উঠবে। এধরনের প্রশ্ন তো আছেই। মৌলিক প্রশ্ন কিন্তু সেখানেই। আবার অন্যভাবে দেখুন। রাজনৈতিক দল হিসেবে না দেখে অভিভাবকদের কথাই যদি বলি। সেদিন অভিভাবক সমিতি অভিভাবকদের একটা সভা করলেন। ঢাকা শহরে তো অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ-পনের হাজার অভিভাবক আছেন। তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য কতটা চিন্তিত সেটাও তো বুঝতে পারলাম না। অভিভাবকদের এই সভায় একশ'জন অভিভাবককেও আমি দেখলাম না। আমি অনেক আশা নিয়ে গেলাম যে, অভিভাবকদের কিছু কথা বলবো। সবাই যদি মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু ঠিকঠাক রাখা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, আমি তা মনে করিনা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস, যেটা সশস্ত্র সন্ত্রাস, সেটাকে NON VIOLENT METHOD-এ, সত্যগ্রহ দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। এজন্য সশস্ত্র প্রতিরোধও দরকার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো তা কোনোদিন করবে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রশাসনিক প্রধান, তিনি কোনোদিনই অস্ত্র হাতে নিবেন না, বা কাউকে বলবেন না অস্ত্র হাতে নাও। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ত কোনো লোককেও অস্ত্র নিয়ে থাকতে দিতে আমরা রাজি নই। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে এটা সম্পূর্ণ বিপরীত একটা বিষয়। অতএব অস্ত্রধারী যারা, তারা যাদের লোক তাদেরই বলতে হবে অস্ত্র সম্বরণ করতে। কিংবা যারা অস্ত্র দিচ্ছেন তাদের বলতে হবে। আর মোকাবিলার জন্য যাদের হাতে অস্ত্র আছে, অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা মোকাবিলা করবেন। আমি মনে করিনা এ বিষয়ে আমাদের যতটা দায়িত্ব নিতে বলা হচ্ছে, আমাদের ততটা দায়িত্ব আছে। তবে আমরা অবহিত করে রাখতে পারি। এখানকার অবস্থা কি হচ্ছে না হচ্ছে। যেটা আমি করি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে আমি এখানকার অবস্থা অবহিত করে রাখি। কি ঘটছে না ঘটছে। অতএব বিষয়টা আমি মনে করি যেভাবে দেখা হচ্ছে যে, সব দোষ উপাচার্যের বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, আমি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। এখানে আমাদের দায়দায়িত্ব সামান্যই।

ঢা ডাঃ অনেকে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা সমগ্র সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

ম মিঃ সেটা তো একদিক দিয়ে বটেই। কারণ মূল্যবোধের অনেক পরিবর্তন

হয়েছে। মূল্যবোধের অনেক অবক্ষয় হয়েছে এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেরও পরিবর্তন হয়েছে। অতএব কিছুটা হয়ত সেরকমভাবে চলেই আসছে। রাজনীতি একসময় যতটা পরিচ্ছন্ন ছিল আজ হয়ত ততটা নেই। তার প্রতিফলন তো হবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা না হয় বলতে পারেন যে, আমরা কোনো অপরিচ্ছন্নতার সাথে জড়িত হবো না। কিন্তু বাকিদের ব্যাপারে। এ সমস্ত প্রশ্ন তো এর সাথে জড়িত। বিচ্ছিন্ন তো নয় ব্যাপারটা। অতএব দায়িত্ব প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে। যার যতটুকু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থান যে, তিনি অনেক কথা চাইলেও বলতে পারেন না।

ঢা ডাঃ আপনি ভিসি হিসেবে যোগ দেয়ার পরই ডাকসু নির্বাচন হলো এবং বলা যায় যে শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারদিকে যে সন্ত্রাস তাতে আমরা যারা বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি তাদের ধারণা ছিল সংঘাত অনিবার্য। এরপরও নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এটা কিভাবে সম্ভব হলো বলে আপনি মনে করেন?

ম মিঃ এটা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, ঐ সময়ে যে-কোনো কারণেই হোক, যারা এ নির্বাচনের সাথে জড়িত ছিলেন সবাই আন্তরিক ছিলেন এবং প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করেছেন। যেমন ধরুন সরকার পক্ষ, ছাত্র সংগঠনগুলো এবং আমার ধারণা ছাত্রসংগঠনগুলো যেসব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত তাদেরও একটা আন্তরিকতা ছিল যাতে আর কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়। কারণ তার অল্প কিছুদিন আগে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অতএব সবাই বোধ হয় ভেবেছিলেন যা ঘটে গিয়েছে, আর যেন না ঘটে। আমি একথাই বলতে চাচ্ছি যে, সবাই যদি আন্তরিক হন তবে কেন সন্ত্রাস থাকবে? আর প্রশাসনিক ভূমিকা যে নেই তা নয়। প্রশাসনিক ভূমিকা অবশ্যই আছে। আমি বিষয়গুলি সবসময় মনিটর করি। ছাত্রদের কাছে চলে যাই। তাদের সাথে কথা বলি। জানতে চাই তাদের মনোভাব। যেখানে যতটা সাহায্য নেয়া দরকার, তার চেষ্টা করি। আমি তো ঘরে বসে থাকিনা। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আমাদের তো ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আমি ঐ বিষয়টাই বার বার বলতে চাই যে, সশস্ত্র সন্ত্রাস প্রতিরোধ করার কোনো কাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এই বিষয়টা বুঝতে হবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষারোপ করে পার হওয়া যাবে না।

ঢা ডাঃ বাইরে তো অনেক জায়গায় ক্যাম্পাস পুলিশ আছে এবং এখানেও একবার এ ধরনের আলোচনা হয়েছিল। তাদের হাতে আইন প্রয়োগের যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়। এ ব্যাপারটা কি আবার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে?

ম মিঃ কেউ কেউ বলছেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নই। আমি যেটা বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনেভুক্ত কোনো লোক অস্ত্র হাতে নিয়ে

থাকবে, এটাই যদি ক্যাম্পাস পুলিশের ধারণা হয় তবে, আমি এর পক্ষে নই। কেননা যেহেতু আমরা দাবি করছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে অস্ত্রবাজীটা সংগতিপূর্ণ নয়। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনেভুক্ত কোনো লোক অস্ত্রহাতে নিয়ে থাকবে, এটা হতে পারে না। আর আগের যে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা ছিল, তার থেকে এখন বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছুটা পিছু হটে এসেছি। এই অর্থে যে, আইন আছে তা এখানেও প্রয়োগ হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়, সেক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত যেটা বলা হয় যে, বিদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস পুলিশ রয়েছে। আমেরিকাতে রয়েছে, এটা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু সেটা এই ধরনের বিষয় TACKLE করার জন্য নয়। আসলে ওখানে ছাত্রদের মধ্যে এ ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ হচ্ছে না। সেগুলো সামান্য অপরাধ। যেমন, মাদকতা, বইয়ের পাতা কাটা কিংবা কোনো মেয়ের সাথে কোনো ছেলের দুর্ব্যবহার ইত্যাদি ছোটখাট বিষয়গুলো তারা দেখে। সশস্ত্র সংঘর্ষ ছাত্রদের মধ্যে, এটা ঠিক নেই সেখানে।

ঢা ডাঃ সন্ত্রাস তো শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়। সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনেই সন্ত্রাস বিস্তৃত। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন?

ম মিঃ আমি বলবো প্রথমত সংশ্লিষ্ট সকলকে আগ্রহী হতে হবে। রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, প্রশাসন, সরকার, ছাত্র, শিক্ষক-সকলকে আন্তরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত ছাত্র রাজনীতিতে নতুন যে মাত্রা যুক্ত হয়েছে, এই যে সংঘর্ষের রাজনীতি সেটা পরিহার করতে হবে। এটা ছাত্র রাজনীতি নয়। ছাত্র রাজনীতির নামে এটা একটা বিকৃতি। এই বিকৃত রাজনীতি, এই দুষ্ট রাজনীতি পরিহার করার সংকল্প নিতে হবে তাদের। আরেকটা বিষয় অবশ্য দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিককালে। সেটা হলো, ছাত্র নয় অথচ ছাত্র হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছে বহুকাল ধরে। সেটাও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেছে বলে আমার ধারণা। নানান রকম চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে বিগত দিনে এ ধরনের অবস্থা মেনে নিতে। তবে আমার মনে হয় সব মহল থেকে যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ও আগ্রহী হবে, যারা সত্যিকার ছাত্র নয়, তারা এখানে যাতে ছাত্র হিসেবে থাকতে না পারে। যারা ছাত্র তারাই ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। তারা ছাত্র রাজনীতি যেভাবে নিয়ে যায় নিয়ে যাবে। কারণ ছাত্র সংসদগুলো আমরা কিজন্য করেছি। ছাত্র সংসদগুলো করা হয় অনেকগুলো কারণে। তাদের মধ্যে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বা খেলাধুলা ইত্যাদি সংগঠন করবে। ছাত্রদের সমস্যাগুলো প্রশাসনের সামনে তুলে ধরবে, ছাত্র সংসদ বা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই কাজগুলো না করে ছাত্র রাজনীতির নামে দুষিত সংঘর্ষে লিপ্ত

হচ্ছে। এটা চলতে দেয়া যেতে পারেনা। রাজনৈতিক দলগুলো এব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারেন। আমি তাদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি।

ঢা ডাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সংঘর্ষ বা অঘটন ঘটে যায়, তখন পুলিশের ক্যাম্পাসে আসতে অনুমতি লাগে। এটা কি শুধু স্বায়ত্তশাসনের জন্যই হচ্ছে। দেশের অন্য একটা ক্ষেত্রে আইন যেভাবে প্রয়োগ হবে, এখানে ঠিক সেভাবে প্রয়োগ হয় না। সর্ব মহল থেকে বলা হয় যে, এখানে পুলিশ আসলে স্বায়ত্তশাসন লংঘিত হয়েছে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়েছে। এটা কি খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায়?

ম মিঃ এটা আরেকটা দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে হবে। শুধু স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ই নয়। এখানে যারা বাস করেন তারা অত্যন্ত SENSITIVE COMMUNITY, ছাত্রছাত্রী। যাদের বয়স আঠার, বিশ, বাইশ এরকম। অতএব তাদেরকে যদি আগে থেকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে নেয়া হয় তাহলে কিন্তু ভুল করা হবে। বিশেষ করে এসব কাজে যারা জড়িত আছে, তারা তো সংখ্যায় অতি অল্প। আমরা যে জিনিষটা দেখতে চেষ্টা করি, তা হলো এই যে, পুলিশ যাতে অযথা এসে নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি না করে। কারণ এর একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে। দ্বিতীয়ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সরকারেরও তো একটা রাজনৈতিক দল আছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সব সরকারেরই থাকে। এমন যাতে না হয় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্যাম্পাসে এসে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে কাজ করে। আমরা ঠিক সে দৃষ্টিকোন থেকেই বলি যে, আমাদেরকে একটু জানিয়ে আসলেই সুবিধা হয়। পুলিশও কিন্তু সেটাই চায়। আমি দেখেছি, প্রভোষ্ট, হাউজ টিউটররা যদি সাথে থাকেন তবে তাদের বিরুদ্ধে আর অভিযোগগুলো আনা হয়না যে, পুলিশ ছাত্রদের উপর অত্যাচার করেছে। বিষয়টা এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে পরিষ্কার হবে।

ঢা ডাঃ আপনি বললেন, মুষ্টিমেয় কিছু ছেলের জন্য গোটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা জিম্মির পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এই অবস্থার জন্য মুষ্টিমেয় ছেলেই কি দায়ী? নাকি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে যে অসহিষ্ণুতা, তারই একটা প্রতিফলন।

ম মিঃ সেটা তো নিশ্চয়ই এতে CONTRIBUTE করছে। সেটা তো আছেই। কিন্তু তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস থাকার কথা নয়। যদি না ব্যক্তিগত স্বার্থ চলে আসে। আমি কিন্তু আগেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস রয়েছে ঐ সব ব্যক্তির হাতে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যেসব উন্নয়মূলক কাজ হয় তার ঠিকাদারীর বখরা নেয়ার সাথে জড়িত। তাছাড়া আশে পাশের দোকান ইত্যাদি থেকে চাঁদা

তোলা। এসবের স্বাদ একবার যারা পেয়ে গিয়েছে, তারা এর থেকে আর বেরুতে পারছে না। আর অসহিষ্ণুতা তো রয়েছেই। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো দলের মধ্যেই আবার উপদল রয়েছে। আমি মনে করিনা যে, কোনো একটা কারণ এর জন্য দায়ী। অনেকগুলো কারণই এর সাথে জড়িত।

ঢা ডাঃ কোনো ছাত্র যদি অস্ত্র সমেত ধরা পড়ে। তদন্ত করে দেখা যায়, সেই এর সাথে জড়িত। তবে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শাস্তি প্রদান বা বহিষ্কার করতে পারে কিনা? এটা তো তার এখতিয়ারে আছে?

ম মিঃ আমি উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের পরে আগে যে ধরনের ঘটনা ঘনঘন ঘটতো-সে ধরনের ঘটনা ঘটেনি। একটাই বড়ধরনের ঘটনা ঘটেছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর। আমরা এ ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছি। ছোট খাট দু'একটা অবশ্য ঘটেছে। কিন্তু সব তদন্ত কমিটিতেই একটা বিষয় দেখা যায় যে, তদন্ত কমিটির কাছে খুব একটা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে কেউ আসে না। আর অবকাঠামোগত সমস্যাও রয়েছে। তদন্ত কমিটি গঠন করি আমরা শিক্ষকদের দিয়ে। কিন্তু শিক্ষকরা এই যে বিচার কার্য করবেন, নিজেদের কাজ ছেড়ে এতটা সময়ই বা তাঁদের কোথায়। আর তাছাড়া বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভংগির মধ্যে একটা তফাৎ রয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে বিষয়টা খুব বেশি দূর এগোয় না। কিন্তু তার পরও যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, কারোর কাছে অস্ত্র আছে। তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে পারি এবং আমরা নেব। এতে আমরা পিছপা হবো না। তবে আরেকটা দিকও আছে। সেটাও ভেবে দেখা দরকার। সেটা সাধারণত বলা হয় না। অপরাধ দমনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই সবসময় সর্বোৎকৃষ্ট, সেটা নাও হতে পারে। এ বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার। বিশেষ করে অপরাধ যারা করছে, তারা বয়সে তরুণ। এরা তো ঠিক পাঁড় বদমাশ বা অপরাধী নয়। কোনো-না-কোনো কারণে হয়তো এর মধ্যে এসে পড়েছে। অতএব তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেয়ার কথাও তো আমরা ভাবতে পারি। একেবারে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজ বহির্ভূত না করে। যদিও আমাদের বরাবরের ধারণা অপরাধকে চিহ্নিত করে শাস্তি দিলেই অপরাধ কমে যাবে। সেটা সব সময় ঠিক নাও হতে পারে।

ঢা ডাঃ হলে বহিরাগত সমস্যা, অর্থ্যাৎ অনেক বৈধ বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্র কক্ষে উঠতে পারেনা। অন্যেরা বেদখল করে রাখে। এ সমস্যাটা আগেও ছিল। এর কি কোনো উন্নতি করতে পেরেছেন।

ম মিঃ গত দু'তিন বছর ধরে আমরা ভর্তির সাথে সাথে হলের এটাচমেন্টও করে দেই কেন্দ্রীয়ভাবে। তারপর সিট বণ্টন। সব সংগঠনই বলে মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টন করা হোক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তারা আবার নিজেরাই নিজ

নিজ প্রভাবিত এলাকায় নিজেদের ছেলেদের উঠাবারও চেষ্টা করে। হল প্রশাসনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাথে পেরে উঠেনা। কেননা তাদের হাতে অস্ত্র থাকে। ফলে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনসেশন করতে বাধ্য হন। কিন্তু আইন ভাংলে যেটা হয়। এ জায়গায় ভাংলে আরেক জায়গায় কনসেশন করতে হয়। এরকমভাবেই তাদের অবস্থান হয়েই যাচ্ছে। ফলে এই যে দেখা যাচ্ছে, একেক হলে একেক দলের প্রাধান্য। নির্বাচন হচ্ছে, অথচ একই রকম থেকে যাচ্ছে। বদল হচ্ছেনা। এটা তো দখল হওয়ার ফল। এই চর দখলের মতো আর কি। একেক সংগঠন একেক হল দখল করে আছে।

ঢা ডাঃ এটাতো একটা দিক। কিন্তু বৈধভাবে বরাদ্ধ পেয়েছে অথচ সে নেই। এরকম আছেন কিনা?

ম মিঃ এরকম হতে পারে। আমি স্পষ্ট বলতে পারিনা। তবে আমার মনে হয় আছে। কেননা অস্ত্রের জোরে কেউ কেউ অন্যকে উঠিয়ে দেয়। আবার হলে সিট পেয়েও বন্ধুকে সিট ছেড়ে দিয়ে শহরের নিজ বাড়ীতে থাকে এমনও আছে। আর সব ছাত্রছাত্রীকে আমরা যেহেতু সিট দিতে পারি না তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ওভারলূক করি।

ঢা ডাঃ কিছুদিন পূর্বে আপনি এক সেমিনারে বক্তৃতা কালে বলেছেন, শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কম। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ পাওয়া যায় না। অর্থের অভাব শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন কতখানি ব্যহত করছে?

ম মিঃ যথেষ্টই ব্যাহত করছে। তবে আরেকটা দিকও দেখতে হবে, সেটা হলো এই যে, আমাদের অর্থ পুরোটাই সরকারের কাছ থেকে পাই। বাৎসরিক আবর্তক বাজেটের শতকরা নববই ভাগ এবং উন্নয়ন বাজেটের সবটুকুই আসে সরকারের কাছ থেকে। এটা ঠিক যে, আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের এই এই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সরকারকে হয়ত সবদিক বিবেচনা করতে হয়। আরো অন্যান্য সেকটরের অবস্থার দিকে খেয়াল রেখে বাজেট বরাদ্দ করতে হয়। তবুও আমার মনে হয়েছে যে, শিক্ষাখাতকে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য এই মুহূর্তে হয়ত এ কথার পারিসংখিক প্রমাণ দিতে পারব না। এর কারণ এও হতে পারে যে, শিক্ষাকে হয়ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হিসেবে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু আমি মনে করি, এটা উন্নয়নের একটা শর্ত। যা সেদিন সেই সেমিনারে বলেছিলাম। আমি বিশ্বাস করি Human resource যদি Develope না করা হয়, মানব সম্পদের যদি উন্নয়ন না করা হয়, তাহলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবেনা। আবার অন্যদিকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন যদি না হয়, তবে মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে না। কোনোটা আগে কোনোটা পরে সে বিবেচনার প্রশ্ন

আলাদা। কিন্তু আমি মনে করি শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ানো প্রয়োজন। যদিও আমার ধারণা শিক্ষা খুব একটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না।

ঢা ডাঃ তাহলে একটা বিষয় জানতে চাইবো, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পরিবেশ না অর্থ, কোনোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

ম মিঃ পরিবেশ ও অর্থ পরস্পর সম্পর্কিত। আমরা যদি ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা ইত্যাদি কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে পারতাম, তাদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারতাম। ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় থাকে তা কাজে লাগানোর জন্য যদি ভালো বিশ্রামাগার করতে পারতাম। তাদের ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতাম। যেখানে তারা Pleasant Atmospher-এ একটা টিফিন পেত। লাইব্রেরিটা যদি যাবার মতো হতো। আমি সেদিন লাইব্রেরিতে গেলাম। সমস্ত নোংরা। ঐখানে তো যেতেও ছাত্ররা পছন্দ করে না। পরিবেশটাকেও সুন্দর করার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। পরিবেশ বলতে যদি সন্ত্রাস বলেন, তবে তা ব্যাপক অর্থে। কিন্তু শিক্ষার জন্য যে পরিবেশ, অর্থাৎ শহরের পরিবেশ, ডাইনিং হলের পরিবেশ, ক্লাশরুমের পরিবেশ, লাইব্রেরির পরিবেশ। আর্টস বিল্ডিং-এর একটা জানালারও কাঁচ নেই। একটা বাথরুমও ব্যবহার করা যায় না। এই পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের মন মানসিকতাই অন্য রকম হয়ে যায়। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যও অর্থের প্রয়োজন।

ঢা ডাঃ স্যার আপনি ছাত্র রাজনীতির কথা বলেছেন। কিন্তু শিক্ষক রাজনীতি নিয়েও কথা উঠেছে। এ নিয়ে গত বছর পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া হয়েছে। অভিযোগ আছে যে, শিক্ষকরা শিক্ষাদানের চাইতে শিক্ষক রাজনীতি ও অন্যান্য দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। এতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। হাউস টিউটররা আবাসিক ছাত্রদের তত্ত্বাবধান যতটুক করার দরকার করছেন না। ক্লাশে ও তাই। নোটিশ ছাড়াই অনেক শিক্ষক ক্লাশে অনুপস্থিত থাকেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

ম মিঃ সবটাতো অনুসন্ধান করে দেখিনি। তবে কিছু কিছু অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু চিঠিপত্র লেখা হয়েছে, তাতে দেখেছি ফল প্রকাশ দেরীর অভিযোগ করা হচ্ছে। এরকম আরো কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে। আমাদের নিজেদের তৎপরতা একটু বেশি থাকলে এগুলো হতো না বলে আমি মনে করি। কিন্তু তার জন্য শিক্ষক রাজনীতি যাকে বলে, ঠিক সেটা বোধ হয় দায়ী নয়। কারণ রাজনৈতিক দলের সাথে খুব কমসংখ্যক শিক্ষক যুক্ত আছেন। তবে শিক্ষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকার জন্য, অবস্থার মূল্যায়নে বিভাজন রয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে এটা বড় ফ্যাকটর বলে মনে হয় না।

ঢা ডাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতা প্রতিপত্তি বহাল রাখার জন্য শিক্ষকদের একটা রাজনীতি চালু আছে। এটা কতটুকু সত্য। তা আমাদের কোনো ক্ষতি করছে কিনা। আপনি নিজেও একটি গ্রুপের সাথে আছেন। এই যে গ্রুপ, এর কি আদর্শিক ভিত্তি আছে। না শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই এই গ্রুপ করা হয়েছে।

ম মিঃ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে গেলে আমি বড় রকমের একটা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ব। তবে আমার বর্তমান অবস্থান এবং তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাতে কোথাও যদি আমাদের কোনো দোষত্রুটি থাকে তা আলোচনার মাধ্যমে দূর করা যায়। আমরা একদম যে দেবশিশু, তা আমি দাবি করব না। আমাদের দোষত্রুটি থাকতে পারে। কিন্তু তা দূর করা কঠিন নয়। ছাত্র রাজনীতি আজ ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। একইভাবে অভিযোগ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে। আমি বলতে পারি যে, উপাচার্য হিসেবে কোনো গ্রুপে আমার অবস্থান নেই।

ঢা ডাঃ শিক্ষকদের নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে। সেটা ভিন্নকথা। আদর্শিক চিন্তায় ও বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষক রাজনীতি যদি থাকে, আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে হতে পারে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও হাতে পারে-তা শিক্ষার মানের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারটিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

ম মিঃ আমি ঠিক তা মনে করছিনা। কেননা শিক্ষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত বিভাজন রয়েছে, এটাতো ঠিকই। অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাদের যে প্রধান দায়িত্ব, সেখানে যে প্রভাব খুব একটা ফেলছে, তা আমার ঠিক মনে হয় না। আর তা যদি কোথাও কোথাও থেকেও থাকে তা থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে উপাচার্যের পদে যিনি থাকেন, তিনি যদি নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে পারেন তাহলে ওগুলো কমে যেতে বাধ্য।

ঢা ডাঃ সেশন জট সম্পর্কে আপনি ঘোষণা দিয়েছেন যে বাইশ সপ্তাহের মধ্যে কোর্স শেষ করে দিতে হবে। সেশন জট সমস্যা দীর্ঘ দিনের। তা নিরসনের জন্য শিক্ষাবর্ষ বাইশ সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ায় ছাত্ররা সময় খুব কম পাবে বলে মনে করছে। এতে বেশ কয়েকটা ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এটা না করে জট নিরসনে দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা নিলে কি ভালো হতো না?

ম মিঃ না, আমি তা মনে করছিনা। বিষয়টা বোধ হয় বুঝতে কারো কারো অসুবিধা হচ্ছে। এক বছরকে বাইশ সপ্তাহে নামিয়ে আনছি, ব্যাপারটা তা নয়। আসলে বছরের যে ধারণা, তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরের ধারণার তফাৎ আছে। সারা পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনমাস গ্রীষ্মকালের ছুটি থাকে। অর্থাৎ এক

বছর সেখানে নয় মাস। এরপরও একমাস অন্যান্য ছুটি থাকে। অতএব পশ্চিমা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বছর আটমাস। এই আটমাসে লেখাপড়া শেষ করতে হয়। পরীক্ষা নিতে হয়। ফলাফল প্রকাশ করতে হয়। তাহলে ঐ পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যেই লেখা পড়া শেষ করতে হয়। আমি যে বাইশ সপ্তাহের কথা বলছি, তা কর্ম সপ্তাহ। মানে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকার সপ্তাহ। বাইশ সপ্তাহে কোর্স সমাপ্ত করা সম্ভব। একজন শিক্ষক যদি প্রতিসপ্তাহে দু'টি লেকচার দেন, তো চুয়াল্লিশটা হয়। তিনটা দিলে ছেয়ষ্টিটা হয়। এর বেশি লেকচার কোনো কোর্সের জন্য দরকার হয় না। আমিতো ৩০ বছর পড়িয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা কোনো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় যেতে পারব না। আমরা সবসময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। তাই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কিনা, সেটাই সন্দেহ।

তৃতীয়ত, আমি যে বিষয়টার উপর জোর দিচ্ছি শিক্ষক ও ছাত্রদের বলবার চেষ্টা করছি তা হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণ বিষয়টা যেহেতু ব্যতিক্রম, তাই একটু ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ নিতেই হবে। আমরা যদি চাই বৃহত্তর অর্জন করতে, তাহলে কিছুটা Sacrifice করতে হবে। ২/৩ বছরের মধ্যে যদি আমরা একটা Normal Situation নিয়ে আসতে পারি, তবে আমরা নতুন করে আবার চিন্তা ভাবনা করতে পারব। আজকে যদি সব ছাত্র একটা গ্যারান্টি দিতো, আর কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবে না, তাহলে আমি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে পারতাম। আমি নিজেই থাকবো কয়দিন তাইতো জানিনা। অতএব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কে করবে?

ঢা ডাঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়মিত বৈঠক হয়। তাতে শিক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের মনোভাব জানতে পারেন। সেই সুবাদেই আপনার কাছে জানতে চাই, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের মনোভাব কি?

ম মিঃ আমরা তো ওখানে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করি। সেখানে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে যে মনোভাব লক্ষ করেছি, তাতে আমি আন্তরিকতার অভাব দেখিনি। আর তার প্রতিফলন আমি আসার পর একটা জায়গায় তো দেখতে পাই। সেটা হলো এই যে, আমাদের এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যখনই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য চেয়েছি, তখনই তাদের দিক থেকে আন্তরিকতার অভাব এখনও পর্যন্ত লক্ষ করিনি। আর শিক্ষার সমস্যাও যেগুলো আমরা আলোচনা করি, সেখানেও রাষ্ট্রপতি আমাদের কাছ থেকে মত গ্রহণ করেন। তারপর আমরা একটা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌছাই। কারো চিন্তার পিছনে কিছু আছে কি না এটা জানবার তো খুব বেশি উপায় নেই।

ঢা ডাঃ চ্যান্সেলর একটা বিষয়ে ক্ষুব্ধ কি না যে, তিনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে পারেন না?

ম মিঃ উনি তো আর সরাসরি এ ব্যাপারে কিছু বলেননি আমাকে। তবে এটা তো আমরা নিজেরাই দেখি যে, চ্যান্সেলর এখানে আসতে পারেন না। সে ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলেননি কোনোদিন, তবে ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

ঢা ডাঃ কিছুকাল আগে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ কোনো বাইবেল নয়। এটা পরিবর্তন সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও রিজার্ভেশন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে, তাকে আপনারা কিভাবে নেবেন। সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই অধ্যাদেশ পরিবর্তন আসলেই জরুরি কি না?

ম মিঃ এটা নির্ভর করছে, অধ্যাদেশের কোনো অংশটা কে পরিবর্তন করছে। সরকারের কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা মাঝে মধ্যে এসেছে ঠিকই। কিন্তু কোনো অংশ কিভাবে পরিবর্তন করতে চান, আমরা তা জানিনা। শিক্ষকদের ভীতি হলো, হয়ত সরকার অধ্যাদেশের ঐ অংশ পরিবর্তন করতে চান যে অংশে উপাচার্য নিয়োগের বিধান আছে। কিন্তু তারও তো কোনো উদ্যোগ দেখিনা। এটা হলে শিক্ষকরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন। আমিও মনে করিনা এটার খুব একটা প্রয়োজন আছে। তবে অধ্যাদেশের কোনো কোনো জায়গা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। যেমন ধরুন, অধ্যাদেশে বিধান আছে একজন ব্যক্তি দু'বার উপাচার্য হতে পারেন। আমার মনে হয় এটা না থাকাই ভালো। একজন উপাচার্য একটা টার্মে আসার পরে, পরবর্তী টার্মে আসার চিন্তা যদি তার মাথায় থাকে, তাহলে কিছু কিছু বিচ্যুতি তার হতে পারে। After all সবাই তো আমরা মানুষ। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন এই চার বছরই তার টার্ম, তাহলে তিনি আর কিছু পাবার আশায় থাকবেন না। নিয়ম মাফিক কাজ করতে পারবেন। আমি এটা বলছি, মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা। সেইজন্য দুই টার্মটা আমার মনে হয়, না থাকাই ভালো। তারপরে ধরুন, আমাদের Board of advanced Studies. বলে একটা সংস্থা রয়েছে। তার যে গঠন পদ্ধতি, তারও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতার যে সীমারেখা তার মধ্যেও অস্পষ্টতা রয়েছে। তা আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

ঢা ডাঃ আপনি ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। আপানার কি মনে হয় আপনার ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রের যে মান ছিল এখনকার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তাদের মানের কোনো তারতম্য হয়েছে?

ম মিঃ হ্যাঁ, আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেয়ট্টি সাল থেকে আছি। আমি মানের তারতম্য ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ করেছি। যেমন, ভাষাজ্ঞান। শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান সমস্যা বলে একে আমার মনে হয়েছে। ভাষাজ্ঞান যদি শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়ের মধ্যে ভালো না থাকে তবে এই বাহনটি কার্যকর হবেনা। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্কুলিংটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, খুব একটা ভালো পর্যায়ে নেই। তার জন্য ছাত্রদের মধ্যে ভাষাজ্ঞানটা খুব দুর্বল। তার ফলে তারা ইংরেজি বই-পুস্তক পড়তে পারছেনা। আর বাংলা ভাষাও যে তাদের করায়ত্ত, আমার তা অনেক সময় মনে হয় না। আর বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক যথেষ্টসংখ্যক নেই, এটাও আরেকটা কথা। অতএব এটা প্রভাব ফেলছে, শিক্ষার মানের উপরে।

ঢা ডাঃ আর শিক্ষকদের ব্যাপারে কি বলবেন। নতুন যারা শিক্ষক হচ্ছেন তাদের মান-

ম মিঃ আমরা যাদের শিক্ষক নিয়োগ করছি তাঁরা সব উপরের স্তরের ছাত্র। তাঁরা সাধারণত ভালো পরিবার, ভালো ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে আসে। বেশির ভাগ তিনটে চারটা ফার্স্ট ক্লাশ বা ফাস্ট ডিভিশন নিয়ে আসে। তাই এদের অর্জন আমার মনে হয় খুব একটা কম নয়।

ঢা ডাঃ একসময় শিক্ষকতা পেশাকে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে অন্য পেশার চেয়ে আকর্ষণীয় মনে করা হতো। কিন্তু এখন প্রশাসন, ফরেন সার্ভিস এমনকি ব্যবসায়ে পর্যন্ত ভালো ছাত্ররা ঝুঁকছে। এর কারণ কি?

ম মিঃ আমিতো মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ আরো বেশি হয়েছে। কারণ প্রশাসনিক পদ থেকেও কিন্তু অনেকে চলে আসছেন শিক্ষকতায়। শিক্ষকতায় আসতে তাঁরা পছন্দ করছেন। বরং একটা সময় ছিল, বিশেষ করে ষাটের দশকে বেশকিছু ভালো ছাত্র সিভিল সার্ভিসে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা যদি শিক্ষকতায় থাকতেন তবে শিক্ষকতার মান আরো উন্নত হতো। আর শিক্ষক হিসেবে আমরা যাদের নিয়োগ করছি, ছাত্র হিসেবে তারা নিঃসন্দেহে মেধাবী একথাতো আগেই বলেছি।

ঢা ডাঃ আপনি ভাষা সমস্যার কথা বলেছেন। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।

ম মিঃ আমি যখন ভাষার কথা বলেছি তখন বাংলা ও ইংরেজি দুটোর কথাই বলেছি। আসলে মাতৃভাষা বাংলার দক্ষতাও আজকালকার ছাত্রদের খুব একটা নেই। আমরা হাইস্কুলে যখন পড়তাম সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমাদের যে ভাষা জ্ঞান ছিল, এখনকার ছাত্রদের তা নেই। দ্বিতীয়ত ইংরেজি ভাষা। এ সম্পর্কে আমার মতে, ইংরেজি ভাষাকে আমরা সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারব না। এটা বোধ

হয় যৌক্তিক হবে না। কিন্তু সমস্যা যেটা, সেটা হলো ভাষা শিক্ষাদান। স্কুলগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে বলা যায়। ভাষাজ্ঞান তো আসবে প্রাইমারী স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুল থেকে। সেই জায়গাটাই ভাষা শিক্ষার জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তো আর ভাষা শেখা যায় না। গ্রামের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষাতো প্রায় নেই। বাংলাও প্রায় একই অবস্থা।

ঢা ডাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধা কতটা আছে। শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করছেন?

ম মিঃ আমার সাথে যারাই বিদেশ থেকে এসে দেখা করতে চান বিশেষ করে যে সব রাষ্ট্রদূত দেখা করেন, তাঁদের সকলের কাছেই বলি, আমরা যাদের তরুণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছি, তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে। এই প্রশিক্ষণ যে দেশে হতে পারে না, তা নয়। কিন্তু এখনও আমাদের এখানে পি এইচ ডি পর্যায়ের গবেষণা খুব একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারিনি বলে, আমরা বিদেশেই বেশির ভাগ শিক্ষককে পাঠাই। সকলের কাছে একথা বলি, যে, আমাদের তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। অনেকে আগ্রহও দেখান। আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বছর খানেক যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ভালো থাকে তাহলে পরবর্তী বছরে গিয়ে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফললাভ করতে পারব বলে আমার মনে হয়। আমি আসলে অনেকগুলো পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এখনি এ সম্পর্কে সব বলছি না। কেননা এখনো এগুলি সব আকার ধারণ করেনি।

ঢা ডাঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক গবেষণার জন্য বিদেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। আমাদের তরুণ শিক্ষকরা যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের ফিরে আসার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কিনা—

ম মিঃ এটা একটা বড় জটিল প্রশ্ন। আমাদের আইনের এই জায়গায় একটুখানি, বলা যেতে পারে যে, Deficiency রয়েছে। আমাদের এখানে চাকরী নেয়া বড় শক্ত। বিশেষ করে একজন শিক্ষকের। আমরা লক্ষ করছি যে, অনেকে বিদেশে চলে গিয়ে আর দেশে ফিরতে চাচ্ছেন না। তবে তারা যাতে ফিরে আসেন তার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রায়ই ফিরে আসেন। কেউ কেউ রয়ে যান। বিশেষ করে যারা স্টেটস-এ যান তাদের কেউ কেউ রয়ে যান। অন্য দেশে গেলে ফিরে আসেন। আসলে এখন দেশের সামগ্রিক অবস্থা এমন হয়েছে যে, বাবা মাও তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে আরামে থাকতে চান। কারণ অনেকে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান। আমি সেটা মনে করিনা। তবে আমি মনে করি দেশের প্রতি কর্তব্য বোধ সকলের থাকা উচিৎ।

ঢা ডাঃ আপনারা যখন ছাত্র ছিলেন, তখন কিছু মূল্যবোধ লালন করতেন।

বলেছেন মূল্যবোধ Static নয়। এখনকার ছাত্রের মূল্যবোধের সাথে আপনাদের সময়ের অনেক ব্যবধান আছে। কিন্তু অনেকে বলছেন অবক্ষয় হয়েছে। আপনি সময়ান্তরে মূল্যবোধের পরিবর্তনটাকে কিভাবে দেখছেন?

ম মিঃ কতকগুলো মূল্যবোধ, যদিও আমি বলবো সময়ের পরিবর্তনে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বদল হতে পারে কিন্তু কতগুলো মূল্যবোধ আছে, যা চিরন্তন। যা আমার মনে হয় সবসময়ের জন্য শোভন, উপযোগি ও প্রয়োজনীয়। যেমন একজন ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে, এই মূল্যবোধ পরিবর্তনের তো কোনো কারণ দেখিনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেখানেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখেছি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আমাদের জন্য। এই ধরনের পরিবর্তন তো নিশ্চয়ই কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আরেকটা বিষয়-যা আগে বলেছি, ছাত্র রাজনীতিতে যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, সন্ত্রাসী রাজনীতি, সেটাও যে কোন মূল্যবোধের মধ্যে পড়ে আমি জানিনা। একে আমি কোনোক্রমেই গ্রহণ করতে রাজি নই। তারপর আমি যেটা শুনতে পাই-যদিও আমার কাছে পরিসংখ্যান নেই। কেউ কেউ আমাকে একটা ভয়াবহ চিত্র দিয়েছেন। তরুণ সমাজের মধ্যে মাদকতাটা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই। এটা যদি হয় তবে এটাকে আমি অবক্ষয়ই বলবো। যে-কোনো সামাজিক কারণেই হোক এটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

ঢা ডাঃ আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। শিক্ষকতা পেশা যখন বেছে নেন, তখন আপনার সামনে নিশ্চয়ই বড় একটা মিশন ছিল। দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে আপনার অনেক উত্তরণ হয়েছে। ব্যক্তি জীবনে আপনার অনেক সাফল্য এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনি এখন ভাইস চ্যান্সেলর। শিক্ষকতার শুরুতে আপনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা কতটা সফল হয়েছে বলে আপনার মনে হয়।

ম মিঃ একটা সময় ছিল এদেশে। যখন ছাত্ররা শিক্ষকদের বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া করতো এবং বাড়ীতে থেকে যেত। সে বহুকাল আগে। পুরোন কালের কথা। সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজকে আর সেটা সম্ভব নয়। তারপরেও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সময় ছিল, যখন ছাত্রসংখ্যা ছিল কম। তখন ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের মেলামেশার সুযোগ ছিল বেশি। কিন্তু এখন শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষকদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের মেলামেশার সুযোগ অত্যন্ত কম। সেই জন্যই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরে নিজের চিন্তাচেতনা দিয়ে অন্যকে প্রবাবিত করার সুযোগ অত্যন্ত কম। আজকাল ছাত্রছাত্রীরা তা খুব একটা পছন্দও করে বলে মনে হয়না। অতএব একজন শিক্ষক তার চিন্তা ভাবনা দিয়ে অন্যকে

শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলবে, সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা আজকাল আর নেই। তবুও আমি বলবো একজন শিক্ষক চাইলে, একজন ছাত্রকে তার স্নেহ দিয়ে, তার আদর দিয়ে, তার ভালোবাসা দিয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনার দ্বারা কখনো কখনো প্রভাবিত করতে পারেন। আমি যতদিন শিক্ষকতা করেছি, বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত স্নেহ করেছি, আদর করেছি। চেষ্টা করেছি আমার কথাবার্তা বলবার। যখন বক্তৃতা দিই। খুবই অনানুষ্ঠানিক বক্তৃতা দেয়ার চেষ্টা করি।

ঢা ডাঃ কখনোও কি আপনার মনে হয় শিক্ষকতা জীবন বেছে নেয়া আপনার ঠিক হয়নি?

ম মিঃ না তা মনে হয়নি। কখনোই মনে হয়নি।

ঢা ডাঃ আপনি কি কখনো এ স্বপ্ন দেখতেন যে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবেন?

ম মিঃ না ঠিক ওভাবে কখনো চিন্তা করিনি। ক্রমান্বয়ে এ চিন্তা এসেছে। তবে যেন-তেন-প্রকারণে এ পদ পেতে হবে এ কথা কখনো মনে করিনি।

ঢা ডাঃ আপনার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড় স্মৃতি কোনোটি, যা আপনাকে বেশি নাড়া দেয়?

ম মিঃ তেমন কোনো ঘটনার কথাতো এমুহূর্তেই মনে পড়ছে না।

ঢা ডাঃ আপনার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক কে?

ম মিঃ সে যদি বলতে হয় তবে বলবো, প্রয়াত শিক্ষক এম, আই, চৌধুরী সাহেবের কথা। আমি যখন রাজশাহী কলেজে ভর্তি হই প্রথম বর্ষে তখন তার সবকিছুই আমার ভালো লাগতো। শেষদিন পর্যন্ত তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল।

ঢা ডাঃ বিদেশে আপনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন?

ম মিঃ আমি আমার ডক্টরাল কাজের জন্য প্যারিসের সরবোণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি। পোস্ট ডক্টরাল পড়াশুনা করেছি। ইষ্ট এ্যালিংয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঢা ডাঃ শিক্ষকতা জীবনে আপনার সবচেয়ে সুসময় কখন কেটেছে?

ম মিঃ সেটা বলতে গেলে আমি বলবো যে প্রথম যখন এই বিশ্ববিদ্যলয়ে শিক্ষকতা করতে আসি, তখন আমার খুব ভালো লেগেছিল। আর আরেকটি সময় যখন আমি ডীন ছিলাম বিজ্ঞান অনুষদের।

ঢা ডাঃ আর সবচেয়ে পীড়াদায়ক সময় কোনোটি ছিল?

ম মিঃ আমাকে মাফ করবেন, এ কথার উত্তর আমি দিতে চাইছি না।

ঢা ডাঃ আপনি অবসর সময়ে কি করেন?

ম মিঃ আমি এখন অবসর সময় তো খুব একটা পাইনা। তবে অবসর সময়ে গান শুনে, বই পড়ে কাটাই। বেশিরভাগ সময়ই আমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা

বলতেই পছন্দ করি। যদি কেউ ডাকে। এমনি আলাপ করা, কথাবার্তা বলা এইটিই আমার বেশি পছন্দনীয়।

ঢা ডাঃ আমরা শুনেছি আপনি বিড়াল পোষেন।

ম মিঃ হুঁ আমার একটা বিড়াল ছিল। খুবই সুন্দর। তার আকারও ছিল বিরাট। আমি যখন বিদেশে গেলাম তখন সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক নজমুল করিম সাহেবের বাসায় রেখে গিয়েছিলাম। করিম সাহেবের দু'টো মেয়ে ছিল ওরা খুব পছন্দ করতো। আমি ফিরে এসে যখন চাইলাম, আর তারা দিতে চায়না। ওদের ওখানেই ছিল। মাঝে মাঝে আমি নিয়ে আসতাম। বিড়ালটা আদর পেয়ে পেয়ে এমন হয়েছিল, কিছুটা মানবিক গুণাবলী পেয়ে গিয়েছিল কিনা জানিনা। মানুষ দেখে ভয় পেতনা। সরেও যেত না। ঐ অবস্থায় একদিন গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। খবরটা ওরা আমাকে দেয়নি, আমি ব্যথা পাব বলে। কিন্তু খবরটা যখন পেয়েছিলাম, তখন খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। এরপর অনেকদিন আর বিড়াল রাখিনা। কারণ, আমার স্থিতি খুব একটা নেই বলে। জীবজন্তু পুষে, একটা মায়া হয়ে গেলে, কোথায় যাই। কোথায় থাকি, এইসব চিন্তায়। এখন আবার দেখছি একটা ছোট বিড়াল বাচ্চা কে যেন আমার বাসায় এনেছে।

ঢা ডাঃ আপনার পড়াশুনা করার সবচেয়ে প্রিয় সময় কোনটা?

ম মিঃ সময় তো খুব একটা পাইনা। তবে একদম সকাল বেলাটায় পড়াশুনা করি।

ঢা ডাঃ এখন আপনার কোনো ধরনের পড়াশুনায় আগ্রহ?

ম মিঃ আমার অবশ্য পড়াশুনা করার নির্দিষ্ট বিষয় নেই। নিজের বিষয়ের বাইরেও পড়াশুনা করি। উপন্যাস; জীবনীগ্রন্থ পড়ি। জীবনী পড়তে আমার ভালো লাগে। মহাপুরুষদের জীবনী। বিশেষ করে সেটা যদি আত্মজীবনী হয়।

ঢা ডাঃ সংসারের দায়দায়িত্ব আপনি কতটা পালন করেন?

ম মিঃ নিজেকে নিয়েই আমার সংসার। সেই অর্থে সংসার আমার খুব ছোট। দায়-দায়িত্বও খুব একটা নেই। আমার যারা পাচক-বাবুর্চী আছে তারাই পালন করে।

ঢা ডাঃ আপনাকে কি কখনো একাকিত্ব পেয়ে বসে?

ম মিঃ আমি এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। খুব একটা একা মনে হয় না।

ঢা ডাঃ আপনি এই একাকিত্বের জীবন বেছে নিলেন কেন? অনেকেরই জানবার আগ্রহ?

ম মিঃ না ঠিক বেছে নেয়ার ব্যাপার না। ইচ্ছে করেই যে এমন জীবন বেছে নিলাম, তেমন নয়। অন্য রকম ঘটে নি আর কি।

ঢা ডাঃ এর জন্য কি কোনোরকম মানসিক কষ্টে ভোগেন?

ম মিঃ আমার মনে হয় না। আমি ভালোই আছি।

ঢা ডাঃ আপনার নিকটাত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ কতটা। মানে পারিবারিক পরিবেশ যাকে বলি, সেটা কি এনজয় করেন।

ম মিঃ সেটাও ক্ষীণ। তবে শহরে আমার নিজের ভাই আছে। তার সাথে আমার যোগাযোগ হয়। একাডেমিক কারণেও তার সাথে যোগাযোগ হয়। এছাড়া চাচাত-মামাতো-ফুপাতো ভাই-বোনেরা সব আছে। তাদের কাছেও মাঝে মাঝে যাই। আরেকজন ব্যক্তি, যিনি সুপ্রীমকোর্টের বিচারক। অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর কাছে আমি মাঝে মাঝে যাই। তিনি আমার একজন শুভাকাংখী। তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যার কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ করি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি বিচারপতি হাবিবুর রহমান শেলী।

ঢা ডাঃ আপনি যদি বেয়াদবী না নেন তবে একটা প্রশ্ন করব। আপনি কি কখনো কোনো নারীর প্রেমে পড়েছেন?

হো হো করে হেসে প্রফেসর মনিরুজ্জামান বলেন, একজন উপাচার্যের পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া ঠিক হবে না।

ঢা ডাঃ আপনি হয়ত এক সময় উপাচার্য থাকবেন না। অনেকে হয়ত আপনার জীবনের এই ব্যাপারটা জানতে চাইবে। কেননা মানুষ হিসেবে আপনারও জীবনে বৈচিত্র আছে—

ম মিঃ মানুষ হিসেবে মানুষের যে স্বাভাবিক দুর্বলতা যে আমারও নেই তাতো আর অস্বীকার করা যাবেনা। এ প্রসঙ্গ আজকে থাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট : সমাধান কীভাবে*

সাপ্তাহিক রোববারের একটি সাক্ষাৎকার

রোববার ঃ উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী ফিরে যাবার কারণগুলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ঃ কারণ একটিই, আর তাহলো সংখ্যাধিক্য। শিক্ষার মানের অবমূল্যায়ন না করে বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যতসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান সম্ভব উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তার থেকে অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হচ্ছে। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যেভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রোববার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীট সংখ্যা না বাড়ানোর কি-কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ডঃ মোঃ মাঃ মিঞা ঃ দ্বন্দ্বটি হচ্ছে সংখ্যার চাপ এবং শিক্ষার মান সংরক্ষণের মধ্যে। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হঠাৎ করে আসন সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তা আরো প্রযোজ্য। কেননা, এখানে বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোতে স্থান সংকুলানের বিষয়টিও চলে আসে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা, পাঠাগারের সমস্যা, শ্রেণীকক্ষের ধারণ ক্ষমতা, ইত্যাদি প্রশ্ন তো রয়েছেই। তাই ভৌত সুযোগ-সুবিধাদি না বাড়িয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়।

রোববার ঃ ভর্তির এ সংকট মোকাবেলায় এবং তথাকথিত কেরাণীকুল তৈরি না করে অন্তত মেধাবীদের জন্য কিভাবে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

ডঃ মোঃ মঃ মিঞা ঃ আমি আগেই বলেছি যে, জনসংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির

---

* ১৯ এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে মুদ্রিত। তখন ডঃ মিঞা বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ছিলেন।

সঙ্গে শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি সমহারে হয়নি। অতএব আমার মতে, উচ্চতর পর্যায়ে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমেই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা যেতে পারে। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উচ্চশিক্ষা দেশের উন্নয়নে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা যেন আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

রোববার : কলেজ থেকে অনার্স পাস করা ৯৫,০০০ ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রিতে ভর্তি হতে না পারার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ডঃ মোঃ মঃ মিঞা : কারণ একটিই এবং তা হচ্ছে এত অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। এক্ষেত্রে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার মতো এ সমস্যাটিও সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকারই ফল। এ থেকে মুক্তির আশু উপায় দেখছি না। তবে সমস্যাটি উন্নত-মানের কলেজগুলোসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে ভাগ করে নিলে আপাতত একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে রবীন্দ্র মোদক।

উৎস : ১৯ শে এপ্রিল, ১৯৮৭, ৯ম বর্ষ, ২৭ তম সংখ্যা সাপ্তাহিক রোববার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশন—১৯৯০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ৩রা মে, ১৯৯০ ইং বৃহস্পতিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটের সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য এবং সিনেটের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন :

১। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
(ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা)।

২। প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
(ড. এমাজউদ্দীন আহমদ)।

৩। কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
(ড. আবদুল্লাহ ফারুক)।

৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।
(জনাব নূরুদ্দিন এম. কামাল)।

৫। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।
(জনাব জামাল হোসেন)।

৬। মহা-পরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
(জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী)।

৭। মহা-পরিচালক,
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
(জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী)।

৮। মহা-পরিচালক, নিয়েয়ার, ঢাকা।
(জনাব আবু মোহাম্মদ)।

৯। জনাব মোঃ নূরুল আমিন খান পাঠান, এম.পি.
১৬/২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

১০। জনাব জাহাঙ্গীর মোঃ আদেল, এম.পি.
(বায়তুল হোসেন, ২৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা)।
২৯, আবুল খায়রাত রোড, ঢাকা।

১১। জনাব আবুল খায়ের চৌধুরী, এম.পি.
সমুদ্রযাত্রা শিপিং লাইন্স লিঃ, ওয়াসা ভবন, (২য় তলা),
২৭/৩৪, কাওরান বাজার, ঢাকা।

১২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, এম.পি.
১২৫/২, সড়ক নং-১৯, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

১৩। অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ,
উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১৪। অধ্যাপক এস.জেড. হায়দার,
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫। বেগম হোসনে আরা শাহেদ,
অধ্যক্ষা, শেরে-বাংলা মহিলা কলেজ, হাটখোলা রোড, ঢাকা।

১৬। অধ্যাপক মোঃ নোমান,
কোষাধ্যক্ষ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

১৭। অধ্যাপিকা হাজেরা নজরুল,
ভাইস-প্রিন্সিপাল, বদরুন্নেছা মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

১৮। মহা-পরিচালক, বি.আই.ডি.এস. আগারগাঁও, ঢাকা।
(ড. মাহবুব হোসেন)।

১৯। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,
জয়দেবপুর, গাজীপুর।
(ড. মোহাম্মদ হোসেন মণ্ডল)।

২০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান,
শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা। (ড. আবু আবদুল্লাহ জিয়াউদ্দিন আহমদ)।

২১। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। (ড. সফর আলী আকন্দ)।

২২। পরিচালক, চা-গবেষণা ইনস্টিটিউট,
শ্রীমঙ্গল, জেলা—মৌলভী বাজার। (ড. এস.এ. রশীদ)।

২৩। অধ্যক্ষ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা।
(সৈয়দা শামসে আরা হোসেন)।

২৪। অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।
(মিসেস রাশিদা বেগম)।

২৫। অধ্যক্ষ, আনন্দ মোহন সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ।
(জনাব নাজির উদ্দিন আহমেদ)।
২৬। অধ্যক্ষ, কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজী, ঢাকা।
(ড. মোস্তাফিজুর রহমান)।
২৭। অধ্যক্ষ, নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ।
(জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস)।
২৮। মিসেস লাকী নাছরিন,
দর্শন বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।
২৯। ডা. এ.কে.এম. আবদুস সালাম,
প্রফেসর, এনাটমি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৩০। মিসেস আয়েশা সিদ্দিকা,
রসায়ন বিভাগ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
৩১। জনাব মোশাররফ হোসেন,
অর্থনীতি বিভাগ, গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ।
৩২। মিসেস আফরোজান নাহার রাশেদা,
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।
৩৩। মিসেস আনিস ফাতেমা,
ইতিহাস বিভাগ, বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ, ঢাকা।
৩৪। মিসেস ইউ. এস. জেড. সুলতানা বেগম,
অর্থনীতি বিভাগ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
৩৫। জনাব আবুল হাসান,
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
৩৬। জনাব মোঃ আমির হোসেন মিয়া,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বি.এম. কলেজ, বরিশাল।
৩৭। ড. আমিনুল ইসলাম;
অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৩৮। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ,
অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৩৯। ড. এ.এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪০। ড. এম. আমিনুল ইসলাম,
অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৪১। ড. এস. এম. এ. ফায়েজ,
অধ্যাপক, মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪২। ড. এ.টি.এম. জহুরুল হক,
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৩। ড. আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী,
অধ্যাপক, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৪। ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী,
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৫। ডা. মোঃ শাহাদত আলী,
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৬। ড. মোহাম্মদ মসিহুজ্জামান,
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৭। ড. এ.বি.এম. মাহমুদ,
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৮। ড. এ.এম. হারুন অর-রশীদ,
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৪৯। ড. সৈয়দ মোঃ হুমায়ূন কবির,
অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫০। ড. খন্দকার বজলুল হক,
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫১। ড. ম. আখতারুজ্জামান,
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫২। ড. মোঃ মোস্তাফা চৌধুরী,
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫৩। ড. আবদুল জব্বার মিঞা,
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫৪। ড. হুমায়ূন আহমদে,
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫৫। জনাব এম. শাহজাহান মিনা,
সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।
৫৬। ড. ওয়াকিল আহমদ,
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৫৭। ড. মোঃ এনামুল হক,
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৫৮। ড. রংগলাল সেন,
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৫৯। ড. রাজীব হুমায়ূন কবির,
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬০। ড. এ.এফ. ইউসুফ হায়দার,
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬১। জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন,
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬২। ড. মোঃ আলতাফ হোসেন,
সহযোগী অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৩। ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ,
অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৪। ড. আবু বকর সিদ্দীক,
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৫। ড. আমিনুল ইসলাম,
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৬। ড. নূরুন নাহার রহমান,
সহযোগী অধ্যাপিকা, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৭। ড. মোঃ আবদুল মান্নান,
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ।

৬৮। জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ,
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, রোল, জহু—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৯। জনাব মুশতাক হোসেন,
পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭০। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,
পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট,
রোল, ফ,জ,—১৬৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭১। জনাব শেখ মুস্তফা ফারুক,
প্রযত্নে—ডাকসু ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭২। জনাব এস.এম. কামাল হোসেন,
গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বিভাগ, রোল, ক,জ—১৫৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় সঙ্গীত ও তেলাওয়াতে কোরআন

সভার প্রারম্ভে টেপ রেকর্ডারে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। জাতীয় সঙ্গীতের পর বাংলা অনুবাদসহ পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়ার পেশ ইমাম জনাব হাফেজ মোঃ খলিলুর রহমান।

প্রয়াতদের জন্য মাগফেরাত কামনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন

অতঃপর মাননীয় চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩১-৮-৮৭ ইং তারিখ থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নোক্ত শিক্ষক, ছাত্র, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুবরণ করেছেন :

১। রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ নুরুল আমিন, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবি মোঃ নিজামুল হক, প্রাণ রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম, লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব এ.কে.এম. আহসানুল হাবীব, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মাজহারুল হক চৌধুরী, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক ড. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক দেশ বরেণ্য চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন সুপারনিউমারারি শিক্ষক জনাব মুফাস্‌সিল উদ্দিন আহমদ, অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এ.এন.এম. মাহ্‌মুদ, ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শাহ মোঃ ফজলুর রহমান, আইন বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ নূরুল মোমেন।

২। জহুরুল হক হল সংসদের সহ-সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম (চুন্নু), ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র মোঃ আরিফ আহমদ, সূর্যসেন হলের বজলুর রহমান খান (শহীদ), মোঃ মহিউদ্দিন ও মোঃ আলমগীর কবির (লিটন), কবি জসিমউদ্দিন হলের মোঃ মিজানুর রহমান তফাদার ও মোঃ আতাউল হক, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের মোঃ নূরুল ইসলাম, জগন্নাথ হলের প্রদীপ কুমার হাওলাদার ও মার্টিন গোমেজ, ফজলুল হক হলের এফ, এম, শরীফুল ইসলাম, শামসুননাহার হলের শাহীন আরা বেগম এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৩য় বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র আবু আহসানুজ্জামান।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ওসমান গণি।

৪। জাতীয় অধ্যাপক এম. ইব্রাহীম।

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রী, অফিসার, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সিনেটের এই বিশেষ অধিবেশনে আমরা তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

উপরোক্ত বক্তব্য পাঠের পর সভাকক্ষে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে মরহুমদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

উপাচার্যের প্রারম্ভিক বক্তব্য

অতঃপর সিনেটের এই বিশেষ অধিবেশনের পটভূমি সম্পর্কে মাননীয় সভাপতি নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, সিনেটের আজকের অধিবেশন একটি বিশেষ অধিবেশন। এর একটি পটভূমি আছে, যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সিনেটের কার্যকাল ২৫-৬-৮৮ তারিখে শেষ হয়। ঐ তারিখের আগে উক্ত সিনেটের শেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল ২০-৬-৮৮ তারিখে। কিন্তু কতগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপেক্ষিতে তৎকালীন উপাচার্য মহোদয় ও সিনেটের সভাপতি ঐ দিন সিনেট অধিবেশন পরের দিন অর্থাৎ ২১-৬-৮৮ তারিখ বিকাল ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। কিন্তু পরের দিন তিনি তাঁর স্বাক্ষরে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সিনেটের অধিবেশন স্থগিত করেন। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার উপাচার্যের নির্দেশে ২২-৬-৮৮ তারিখে সিনেটের অধিবেশন আহ্বান করে আর একটি বিজ্ঞপ্তি দেন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে আদালতের নিষেধাজ্ঞার ফলে উক্ত অধিবেশন হতে পারেনি। পরবর্তী বছরে ২৮-৬-৮৯ তারিখে ৫ম সিনেটের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। উক্ত সভাও আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। নিষেধজ্ঞাটি ২৭-৬-৮৯ তারিখে জারি হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐ তারিখ থেকে পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত সিনেটের অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কার্যকর পন্থা বা পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ বছরের প্রথম থেকেই সিনেটের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চাপ দিতে থাকে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তখন মামলাটি

পরিচালনার জন্য একজন কৌঁসুলি নিয়োগ করেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চতুর্থ সহকারী জজের আদালতে এ সংক্রান্ত মামলাটির ২৮-২-৯০ তারিখে রায় হয়। এ রায়ে অবশ্য সিনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠেনি বরং তা Absolute করে দেয়া হয়। ১লা মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত পুনর্বার বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক গড়িমসি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান পদত্যাগ করেন। ২৪শে মার্চ ১৯৯০ তারিখে আমি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার দিনই সিনেট সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং আইন উপদেষ্টার সাথে আলাপ-আলোচনাকালে লক্ষ করি যে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করার জন্য একজন কৌসুলি নিয়োগ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাগজপত্র আগের কৌসুলির নিকট রয়ে গেছে। যে কৌসুলিকে নিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তিনি যেহেতু শিক্ষক সমিতির মনোনীত কৌসুলিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এবং যেহেতু নতুন একজন কৌসুলি নিয়োগ করলে মামলাটি পরিচালনায় অহেতুক সময়ক্ষেপণ হতে পারে সেহেতু আমরা পূর্বের কৌসুলিকেই নিয়োগ করার আদেশ দেই। তিনি যথারীতি উচ্চতর আদালতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মিস আপীল দায়ের করেন। দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মহোদয় ৭-৪-৯০ তারিখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দ্বারা আপীলের চূড়ান্ত শুনানী না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখেন। এই আদেশের সত্যায়িত কপি আমরা ১৪-৪-৯০ তারিখে সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর ২১ (২) নম্বর ধারায় উপাচার্যকে অর্পিত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং সিনেটের সচিবকে সিনেটের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করতে নির্দেশ দেই। তদনুসারে তিনি ১৬-৪-৯০ তারিখে আজকের সিনেটের এই বিশেষ সভা আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। ইতিমধ্যে মাননীয় আদালত উভয় পক্ষের শুনানীর পর ৩০-৪-৯০ তারিখে রায় ও আদেশ দ্বারা নিম্ন আদালতের ২৮-২-৯০ তারিখের সিনেট সভার উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান পদত্যাগ করার ফলে উপাচার্যের পদে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য মহামান্য চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর ১১ (২) ধারা বলে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত আমাকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিনেটের এই বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়েছে ১১ (১) ধারা অনুযায়ী চ্যান্সেলর কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে তিন জনের একটি প্যানেল মনোনয়ন করতে পারেন। আজকের এই বিশেষ সভার আলোচ্যসূচির এই ছিল পটভূমি। আমি এই বলে আলোচ্যসূচি আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান আপনি কি এই মুহূর্তে প্রস্তাব আহ্বান করছেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এটা যেহেতু একটা বিশেষ সভা সেহেতু আমি সরাসরি প্রস্তাবেই যেতে চাই।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় সভাপতি আমি দাঁড়িয়েছি, আপনি বর্তমান সরকারের ষড়যন্ত্রের মধ্যেও আজকে এই বিশেষ সিনেট অধিবেশন ডেকেছেন। এখান থেকে উপাচার্যের প্যানেল মনোনীত হবে। সেজন্য যাঁরা এই বিশেষ অধিবেশনকে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন এবং যে সকল সদস্য এখানে বসেছেন সেজন্য আমি ডাকসুর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই বিশেষ অধিবেশনের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আপনি বলেছেন, যে একটি সিনেট অধিবেশনের পর থেকে আর একটি সিনেট অধিবেশন পর্যন্তকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আত্মাহূতি দিয়েছেন অথবা দুঃখজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন তাঁদের জন্য এখানে শোক প্রস্তাব নেয়া হচ্ছে। কিন্তু আজকের সম্মানিত সভাপতি, আপনি নিশ্চয় অবগত রয়েছেন যে এই সিনেট অধিবেশন বসার পূর্বে এবং গত সিনেট অধিবেশনের পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি কলংকজনক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেটি ছিল গত ডাকসু নির্বাচনের পরের দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিছিলের উপর অতর্কিতভাবে, উলঙ্গভাবে হামলা পরিচালিত হয়েছিল, যা বাংলাদেশের সকল জাতীয় পত্রিকাসহ আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিসহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরিবার সেদিন সেটাকে ঘৃণার চোখে দেখেছিল। কাজেই আমি প্রথমে আপনার শোক প্রস্তাবের সাথে সাথে আজকের এই অধিবেশনে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনি যে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন তাতে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ঘটনাটি ঘটার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। আমাকে আরো বলতে হয়, আমি এই পদে এসেছি একমাস আগে মাত্র। এর মাঝে এক বছর তিনমাস চলে গিয়েছে। আমি আসার এক সপ্তাহ পরে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে এই তদন্ত কমিটির অগ্রগতি জানতে চেয়ে শৃঙ্খলা পরিষদের সভা ডেকেছিলাম। যে চিত্র আমি পেয়েছি সেটা যদি আপনাদের বলি তা অনেক লম্বা ইতিহাস হবে। কেবল এটা সম্বন্ধে একথা বলতে চাচ্ছি যে এটা কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, কারণ দর্শানো পর্যন্ত এগিয়েছে। এরপর পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়া যেতে পারে সেজন্য আমি আইন উপদেষ্টার মতামত চেয়েছি।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান শৃঙ্খলা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপর। কিন্তু এটা একটি নিন্দনীয় বিষয়। কাজেই এটা সরাসরি গ্রহণ করা উচিৎ। যেহেতু ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারির পরে সিনেট অধিবেশন আর বসেনি এবং যেহেতু এটাই প্রথম অধিবেশন সেহেতু এই অধিবেশনে ছাত্রী মিছিলের ওপর হামলার এটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এতে একটি বিধিগত অসুবিধে আছে। সেটি আমার মনে হয় আপনি Appreciate করবেন। সেটা হচ্ছে এই যে, বিশেষ অধিবেশনে কোনো প্রস্তাব নেয়া যায় না। তবে যে শোক প্রস্তাবের কথা বললেন, এটা প্রথাগতভাবে আমাদের এখানে চলে আসছে। সেটাকে আমরা আর অন্য রকমভাবে দেখি না।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় সভাপতি, যেহেতু আমি ইতিপূর্বে সিনেট সদস্য ছিলাম না, সেজন্য এর আগে কোনো বিশেষ অধিবেশনে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিনা তা আমি অবগত নই। কাজেই আমরা বলছি এবং আপনি জানেন যে, যে ঘটনার মধ্য দিয়ে এবং যে পরিস্থিতিগত কারণে আজকের এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী মিছিল এবং এর পূর্বে ও পরবর্তীতে অনেক সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে উপাচার্য ড. শামসুল হক এবং উপাচার্য ড. আবদুল মান্নানকে বিদায় নিতে হয়েছে এবং আপনি এখানে আজকে বসেছেন। সরকার আপনাকে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। আমরা বলতে চাই আজকে সিনেট অধিবেশন যেভাবে এখানে বসেছে এবং যেভাবে শোক প্রস্তাব নেয়া হয়েছে সেভাবে সিনেট অধিবেশনের মধ্য দিয়ে, সিনেট সদস্যদের মাধ্যমে এই সিনেটে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এখন অধ্যাপক আখতারুজ্জামান।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ আমার নাম আখতারুজ্জামান। আমি শিক্ষক প্রতিনিধি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ একটা কথা, এক সেকেণ্ড, যাঁরা এখানে বক্তব্য রাখবেন তাঁরা প্রথমে দয়া করে আপনাদের নামটা উচ্চারণ করবেন। নাম না বললে আমাদের ধারণ যন্ত্রে এটা গৃহীত হবে না।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে যে প্রসঙ্গটি আপনি উত্থাপন করেছেন অর্থাৎ বিশেষ অধিবেশনে অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করা যায় না, সেই বিষয়ে সিনেট বিধির ৮ নম্বর ধারার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এখানে বলা হচ্ছে No businceess, in addition to the

business on the agenda shall be transacted at a meeting of the Senate without the consent of the Chairman and unless permission is givern to introduce it by a vote of majority of the members present—এখানে স্পষ্ট লেখা আছে যে আমরা যে-কোনো বিষয় বিশেষ অধিবেশনেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, আলোচনা করতে পারি এবং আলোচ্যসূচিরও অন্তর্ভূক্ত করতে পারি এবং যে-কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারি। দরকার শুধু চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমতি। কাজেই আমি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদর এ প্রস্তাবটি আলোচনা করার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটি সমর্থন করছি। সে প্রসঙ্গে আমি আরো দু'একটি কথা এখানে নিবেদন করতে চাই।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ—এ বিষয়েই কি?

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ এ বিষয়ে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি একটু সময় নিচ্ছি। যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে সেটি সম্বন্ধে আমরা চূড়ান্ত করে নেই, তাতে আমাদের এগুতে সুবিধে হবে। যতটুকু আমি বুঝি আমাদের অর্ডিনেন্সেস ও রেগুলেশনসে যা আছে এবং আপনি যে আট নম্বর বিধির কথা বলেছেন In my oppinion that applies to normal meetings আপনি হয়তো বলবেন যে কেন? কেন হচ্ছে যাঁরা সিনেটে নতুন এসেছেন তাঁদের জন্য একটু বলা প্রয়োজন বোধ হয়। আমাদের সিনেটের সভা প্রধানত দুই রকমের হতে পারে। এক রহম হচ্ছে বার্ষিক সাধারণ সভা। আর একটি হচ্ছে বিশেষ সভা। বিশেষ সভা আবার দুই রকমের হতে পারে। একটি on requisition by the members. আর একটি উপাচার্য নিজে যদি ডাকেন কোনো বিশেষ করণে। এখন এই বিশেষ সভার জন্য requisition-এ যে বিশেষ একটি সভা, সে সম্বন্ধে আমি একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হলো সিনেট রেগুলেশন্সের পাঁচ নম্বর ধারা। সেটি হচ্ছে "At meetings convened on requisition by members, business other than that in respect of which the requisition was made, may be transacted with the leave of the Senate by the vote of two third members present to be included in the Agenda after the business for which the requisition was made."—এ তলবীসভার কথা। আর একটি রয়েছে সেটা বোধ হয় বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। সেটা হলো সিনেট রেগুলেশনের ৯ (বি) ধারা। সেটি হলো Notice of a motion or resolution, Resolution শব্দটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ মাননীয় সদস্য সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ একটা প্রস্তাবের কথা বলেছেন বলে আমি বলছি। সাধারণ আলোচনা এক কথা আর প্রস্তাব নেয়া ভিন্ন কথা। আমি আবার

পড়ছি। "Notice of motion or resolution to be moved at a special meeting of the Senate must reach the Secretary not less than seven days before the meeting." তার অর্থ হচ্ছে যে যদি বিশেষ অধিবেশনে কোনো প্রস্তাব আনতে হয়, তাহলে অন্তত ৭ দিন আগে তার নোটিশ দিতে হবে। কাজেই আমি বলতে চাচ্ছি এই যে আমরা যদি এ ধরনের বিষয় আনি তা হলে এ বিশেষ সভার যে বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে তা ব্যাহত হবে। আর এখানে বিধি অত্যন্ত স্পষ্ট যে এই বিশেষ সভায় অন্য বিষয় আনলে আমি মনে করি সেটা বেআইনি হয়ে যাবে এমনকি গোটা সভার কার্যক্রমই বেআইনি হয়ে যেতে পারে।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি নিবেদন করতে চাই যে, আপনি সিনেটের যে রেগুলেশন্‌সের কথা বলছেন এটা তৈরির যে কমিটি হয়েছিল প্রথম সিনেটে আমি তার সদস্য ছিলাম। আপনিও এই সিনেটের বহুদিন যাবৎ সদস্য ছিলেন। এখানকার Practice আপনি জানেন। এখানের, সমস্ত বক্তব্য Verbatim রেকর্ড করা হয়। এবং এ ধরনের ঘটনা এখানে ইতিপূর্বে অনেকবার ঘটেছে। আপনি যদি স্মরণ করেন তাহলে দেখবেন এ ধরনের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, এবং তার উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্যে বলছি যে বিশেষ সভায় হয়নি।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ আমি বলছি যে বিশেষ সভাতেও হয়েছে। আপনি যে ৯ নম্বর ধারার কথা বলছেন সেটা হলো সাধারণ সভার ক্ষেত্রে। সাধারণ সভায় প্রস্তাব আহ্বান করা হয় এবং প্রস্তাব দেয়া হয় সেই সংক্রান্ত ব্যাপার, এটা সে ধরনের বিষয় নয় সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ বলেছেন যে এটা বার্ষিক সাধারণ সভা নয়। বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাবও নয়। এখানে তিনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চান।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমার কিন্তু আলোচনা করতে আপত্তি নেই। সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে আছে। কারণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে আমাদের বিশেষ সভার আলোচ্য-সূচি ব্যাহত হবে। কাজেই আমরা বিশেষ সভার আলোচ্যসূচি শেষ করে নিয়ে অন্য আলোচনায় যেতে পারি। সিদ্ধান্ত নিতে গেলে গোটা কার্যক্রম বেআইনি হয়ে যেতে পারে।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ এটা হয়তো আপনার আশংকা। প্রাকটিস যা, আমার যতটুকু মনে আছে, এখানে আরো পুরনো সিনেট সদস্য আছেন, আপনিও ছিলেন, আপনিও স্মরণ করে দেখুন যে এসব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কাজ করেছি। আর আপনার কথাই যদি ধরি যে এখানে আলোচনা করা যাবে অথচ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না এটা কোন ধরনের যুক্তি সেটা আমার বোধগম্য নয়। আমি মনে করি আলোচনা করা যায় যে বিষয়ে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায়। সেটি প্রস্তাবও হতে পারে। অন্য কিছুও হতে পারে। যে-কোনো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি। এখানে দু'টো জিনিস প্রয়োজন—এটা হলো চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি আর একটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেট সদস্যের সম্মতি। এ দু'টো থাকলেই যে-কোনো বিষয় আমরা বিশেষ সভায় আলোচনা করতে পারি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমি যতটুকু জানি এটাই সিনেটের প্র্যাকটিস।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ আমি Point of order-এ দাঁড়িয়েছি, মাননীয় চেয়ারম্যান ৯নং ধারা সম্পর্কে সিনেটে আমার বক্তব্য এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট। চেয়ার থেকে যে বিষয়টি বলা হয়েছে অর্থাৎ ৯ নম্বর ধারা, আমি মনে করি একটু ভালোভাবে আপনার ৯ নম্বর ধারাটি দেখুন। তার ভেতরে একটি প্রোভাইসো রয়েছে তাও দেখুন। You read the whole thing, not a part of it, এখানে বলা হচ্ছে—

Provided that all questions as to whether proper notice of a motion or of an amendment has been given shall be decided by the Chairman of the meeting whose decision shall be final and further that the Chairman may, in his discretion, relax such regulations in cases where members have been debarred by distance or any other reason which the Chairman shall, regard as adequate from giving the full notice required by the regulations.

অর্থাৎ এ বিষয়ে ৯ নম্বর ধারায় যা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী নোটিশ দেয়া যাবে না, ৭ দিনের নোটিশ যদি দেয়া না হয় তবেই বিশেষ সভার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ৯ নম্বর ধারাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বিশেষ সভায় একটিমাত্র কার্যসূচি আলোচিত হবে এমন কোনো নির্ধারিত বিষয় নেই। কেননা ৯ নম্বর ধারায় বিশেষ সভার কথাও বলা আছে। অর্থাৎ ৭ দিন আগে নোটিশ দিতে পারলে এটা হতো। কিন্তু তার সঙ্গে Saving clause রয়েছে সেটা হচ্ছে যদি না দেয়া যায় দূর থেকে এসেছেন অথবা অন্য যে-কোনো কারণ হতে পারে যার জন্য ৭ দিনের নোটিশ দেয়া সম্ভবপর হয়নি সেক্ষেত্রে The Chairman may use his discretion-সে Discretion তিনি এখানে ব্যবহার করবেন কিনা সেটাই হলো বিবেচ্য। আমরা বলতে পারি যে রেগুলেশনস্ এখানে অনেকবার একটু শিথিল হয়েছে। আমি সিনেটের একজন পুরাতন সদস্য হিসেবে এ বিষয়ে অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের সঙ্গে একমত। বিশেষ সভায় অনেকবারই বিধি শিথিল করা

হয়েছে। এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদন ক্রমেই এটা হয়েছে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে যদি চেয়ারম্যান অনুমোদন না করেন তাহলে তাকে বলতে হবে যে আমি এটা অনুমোদন করছি না। কিন্তু যদি তিনি অনুমোদন না করেন, অথচ আলোচনা করতে দেন তাহলে বিষয়টি নিয়মবহির্ভূত কাজ হয়ে রইলো। অর্থাৎ অনুমোদন করলে তাকে এটা পুরোপুরি অনুমোদন করতে হবে। আর অনুমোদন না করলে তাঁকে বলতে হবে আমি এটা দেব না : I have ruled it out, এর মাঝেখানে কোনো পথ নেই। আমি যে কথাটি বলতে যাচ্ছি Relaxation cannot be given partially; it must be give fully. আর এই প্রসঙ্গে আমারও একটা প্রস্তাব রয়েছে। আমি সকল সিনেট সদস্যের কাছে সেটা আমার এবং অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি আকারে দিয়েছি। মাননীয় উপাচার্যের কাছেও এর একটা অনুলিপি দিয়েছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এই যে মূল যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে সেটার সমাধান না করে আর একটি প্রসঙ্গে গিয়ে তো লাভ নেই।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ আমি Point of order-এ দাঁড়িয়েছি। কাজেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করে নেই।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি বুঝেছি আপনার কথা। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে, আমরা এ বিষয়টির আগে সমাধান করে নেই যে আমরা বিশেষ সভায় কর্মসূচি বহির্ভূত কোনো বিষয় আলোচনা করব কিনা বা সিদ্ধান্ত নেবো কিনা। আমার মতে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। It is debarred by section 9 (b) of the Senate Regulations. আর ৮ নম্বর ধারার কথা যেটা বলা হচ্ছে সেখানেও ২১ দিনের নোটিশ এবং সাধারণ সভার ব্যাপার রয়েছে। 9 (b) না থাকলে তাহলে নিশ্চয়ই ৮ নম্বর ধারা প্রযোজ্য হতে পারতো।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান ৮ নম্বর ধারায় কোনো নোটিশের কথা নেই। ৮ নম্বর ধারাটি একটি সাধারণ ধারা।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনি দয়া করে আমার কথাটি আগে শুনে নিন। আমি বলছি 9 (b) ধারা যদি না থাকত তাহলে Section 8 would have covered perhaps everyting. 9 (b) ধারায় যখন একটা Exception করা হচ্ছে বিশেষ সভার ক্ষেত্রে তার অর্থ হলো By implication ৮ নম্বর বিশেষ সভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেটা সাধারণ সভার জন্য। আর একটি বিষয়ে আপনাদের আমি অনুরোধ করব যেহেতু সিনেট সভা বহুদিন বসেনি সেহেতু অনেক বিষয় আমি জানি যে গুরুত্বপূর্ণ, সদস্যদের মনে থাকবে বিশেষ করে যে বিষয়টি জনাব সুলতান

মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ উত্থাপন করেছেন। এ রকম আরো অনেক আছে। এটা আপনারা জানেন যে সিনেটের একটা বার্ষিক সাধারণ সভা জুন মাসে হয় এবং স্বভাবতই সেটা হবে। আমরা আজকে যেহেতু একটা বিশেষ সভায় বসেছি সেহেতু আমি অনুরোধ করব যে এ সভার কার্যসূচি সম্পন্ন করি।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান আমি আমার Point of order এখনো শেষ করতে পারিনি। আমার Point of order এর মাঝখানে কতকগুলো কথা বলা হয়েছে। চেয়ার থেকেও আমার কথার মাঝখানে কথা বলা হয়েছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এই ক্ষমতা চেয়ারম্যানের সব সময়ই আছে।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ কিন্তু আমি আশা করব, সিনেট বিধিতে আমার বক্তব্য শেষ করার যে অধিকার আমার রয়েছে তা চেয়ার কর্তৃক রক্ষিত হবে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনার সেই Point of order কি?

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ আমার Point of order ছিল এই যে ৯ (বি) ধারায় যে কথাটা বলা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে। সেখানে শিথিল করবেন কিনা সেটা চেয়ারের Discretion থাকলেও সেটা Is to be used discretely এবং আমি আমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি কেন নিয়ে এসেছিলাম সেটা বোঝাবার জন্যই আমি বলেছিলাম যে Discretion is to be used discretely which essentially means that all the items placed for discussion by the members must be allowed. আমরা যে প্রসঙ্গটি এনেছি এবং যে পত্রটি আজকে সকালে দেয়া হয়েছে এটা এ কারণেই অত্যন্ত মূল্যবান। সেটা সিনেটের জীবনের জন্য, সিনেটের প্রয়োজনে এর চেয়ে মূল্যবান আর কোনো প্রসঙ্গ থাকতে পারে কি? কেননা এ বিষয়ের উপর নির্ভর করেই একদিন সেনেটের উপর আদালত থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছিল। সে জন্য আমরা এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে বাধ্য এবং এই সভায়ই তা উপস্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধন্যাবাদ।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, Point of order. আমি মনে করি যদি আজকে আপনি এটা Ruling হিসেবে দেন, অবশ্য Ruling হিসেবে এখনো দেননি, তা হলে আপনি আমাদের অধিকার খর্ব করবেন। কেননা আমি বারেবারেই বলছি সিনেট সদস্যদের অধিকার খর্ব করবেন না। এতদিন পর্যন্ত আমরা যে প্র্যাকটিস করে এসেছি আপনাকে অনুরোধ করব, এখানে আপনার আইন উপদেষ্টা আছে বা সিনেটের সচিব সাহেব আছেন তাঁদের কাছ থেকে আপনি জেনে নিন যে, আমি যা বলছি সেটা ঠিক কি না। এবং সে তথ্যের ভিত্তিতে যদি আপনি রুলিং দেন

তা হলে সেটা ঠিক কি না। এবং সে তথ্যের ভিত্তিতে যদি আপনি রুলিং দেন তাহলে সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে। তা না হলে আমি বলবো যে আপনার রুলিং Arbitrary হবে এবং To that extent আমাদের সিনেট সদস্যদের অধিকার খর্ব করা হবে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ সিনেটের কোনো বিশেষ সভায়, যে বিষয়ের জন্য বিশেষ সভা ডাকা হয় সেটা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমরা আরও একটু অবগত হতে চাই এ কারণে যে তাহলে কি আমরা ধরে নেব আজকের সিনেট অধিবেশনে সম্মানিত চেয়ারম্যান আমি যে প্রস্তাব করেছিলাম সে প্রস্তাব তিনি নাকচ করছেন?

জনাব চেয়ারম্যান ঃ না, আমি বলেছি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সভায় যেহেতু আইনের একটি বাধা আছে তা সত্ত্বেও যদি আমরা এই কাজ করি তা হলে গোটা সভার কার্যক্রম বেআইনি হয়ে যেতে পারে। এটাই আমার অনুরোধ ছিল।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, সিনেট সদস্য হিসেবে সিনেট অধিবেশনে আমি বলবো আপনি যেহেতু এটাকে নথিভুক্ত করেননি বা আলোচ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করতে চাচ্ছেন না, যদিও এখানে উপস্থিত সিনেট সদস্যবৃন্দ এটা আলোচনা করতে চাচ্ছেন, আমরা এখানে বিস্তারিতভাবে অবগত করেছি এবং অনুরোধ করেছি, আমার মনে হয় যখন ঘটনাটি ঘটেছিল তখন শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এবং শিক্ষক সমিতির সদস্য হিসেবে আপনিও ঘটনাটির নিন্দা জানিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই যদিও আপনি এটা আলোচ্যসূচিতে আনতে চাচ্ছেন না বা প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না, তবু আজকের সিনেট অধিবেশনে আপনি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে কি মনে করেন, এটাকে কি নিন্দানীয় মনে করেন?

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি এটাকে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় মনে করি। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ তাহলে মাননীয় চেয়ারম্যান, এই একটি বিষয়, যেহেতু আলোচনা শুরু হবে সেহেতু আজকের এই অধিবেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের বক্তব্য রয়েছে ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটের সদস্য হিসেবে। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই সিনেট অধিবেশনে ছাত্রী মিছিলে হামলার বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে আসেনি এ কারণে এবং এর পাশাপাশি আজকের সিনেট অধিবেশনের শুরুতে ১৯৭৩ সালের তখনকার বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রণীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ৫ (পাঁচ) জন সদস্য

সিনেট সদস্য হবেন। আমার মনে হয় সবাই জানেন এবং আজকে এই অধিবেশনে যাঁরা সমবেত হয়েছেন এবং আজকে যিনি এই চেয়ারে রয়েছেন আমাদের সম্মানিত শিক্ষক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এই সংসদকে অবৈধ সংসদ এবং একটি ভোট বিহীন সংসদ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। আপনারা জানেন যে সেই সংসদকে আমরা গ্রহণ করি নি এবং তার Legality আমরা দিচ্ছি না। কাজেই আমরা মনে করি একজন সিনেট সদস্য হিসেবে ঐ ভুয়া সংসদের সদস্য হিসেবে যাঁরা এই সিনেট অধিবেশনে যোগদান করেছেন, আমি মনের করি তাঁরা এই সিনেটকে অবমাননা করেছেন। কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি এ বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তা হলে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা যে ৫ (পাঁচ) জন সিনেট সদস্য রয়েছি তাঁরা এর বিরুদ্ধে অর্থাৎ যেহেতু ছাত্রী মিছিল হামলার বিষয় আলোচ্যসূচিতে দেয়ার জন্য গ্রহণ করেন নি এবং সংসদ সদস্যদের যদি নিন্দা প্রস্তাব না নেয়া হয় তা হলে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা এই হাউস দুই মিনিটের জন্য ত্যাগ করতে বাধ্য হবো। ধন্যাবাদ।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, ছাত্র প্রতিনিধিকে আমি বলবো যে, সভাপতি কোনো রুলিং দেননি, কাজই এ সম্বন্ধে ছাত্র প্রতিনিধির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেবার এখনো সময় আসেনি। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে কথা অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ও অধ্যাপক সাদউদ্দিন বলেছেন এবং এখানে যে কথাটা আছে ৮ নম্বর ধারাটা খুবই পরিষ্কার। সেখানে বলা হচ্ছে সিনেট সভায় যে-কোনো বিষয় আলোচনা করা যাবে যদি অধিকাংশ সদস্য এবং চেয়ারম্যান অনুমতি দেন। কাজেই একটা প্রস্তাব এবং এমনি একটা প্রস্তাব যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংঘটিত একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং মারাত্মক ঘটনা যার সম্পর্কে সে সময়ে অর্থাৎ ১৯৮৯-তে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী একবাক্যে নিন্দা করেছিল। সেই নিন্দা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বডি না করতে পারে, নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারে তা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কম্পোনেন্ট পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাই একবাক্যে এটার নিন্দার নিন্দা করেছে, সিন্ডিকেট নিন্দা করেছেন, সমস্ত জায়গায় এটার নিন্দা হয়েছে। শুধু সিনেট যেহেতু বসেনি সেহেতু সিনেট থেকে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। এ ঘটনার তদন্ত হবে, বিচার হবে, দোষীরা শাস্তি পাবে সেটা পরের ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আইনগত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলামূলক আইন/কানুনের পদ্ধতিতে তদন্ত হোক এবং তরান্বিত হোক এটা আমরা কামনা করি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারব না এই সিনেটে বসে এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে

হয় না। বিধিগত কারণ দেখিয়ে বা আইনগত কারণ দেখিয়ে এটা বোধহয় বন্ধ করা ঠিক হবে না, মাননীয় সভাপতি। আপনি নিজেও বলছেন যে আপনি নিজেও এটার নিন্দা করেন। কাজেই সিনেটের যদি অধিকাংশ সদস্য মনে করেন ঘটনাটি নিন্দনীয় তা হলে ছাত্র প্রতিনিধি যে প্রস্তাব করেছেন সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সিনেট সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব চেয়াম্যান ঃ এবার বলবেন জনাব মুশতাক হোসেন।

জনাব মুশতাক হোসেন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমাকে বলার অনুমতি দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের ছাত্র প্রতিনিধি জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ দু'টি বিষয় তুলেছেন তার একটা হলো সিনেটে অবৈধ পার্লামেন্ট সদস্যদের উপস্থিতি, সেটার আমরা প্রতিবাদ করছি এবং তাঁদের উপস্থিতির জন্য নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা আমি সমর্থন করছি। ছাত্রী মিছিলে হামলার যে নিন্দা প্রস্তাব শোক প্রস্তাবের সাথে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে তার উপর তর্ক-বির্তক নিন্দনীয় কি নিন্দনীয় নয় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। এ রকম যে হবে তা আমরা ভাবিনি। সবাই এটার নিন্দা করেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যানও বলেছেন যে, তিনি এটাকে নিন্দনীয় বলে মনে করেন। শোক প্রস্তাবের অনুরূপ একটা নিন্দা প্রস্তাব ৯-২-৮৯ তারিখে ছাত্রী মিছিলে হামলা সম্বন্ধে এবং তারপর যে বহুসংখ্যক সন্ত্রাসী ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর ওপর একটা সাধারণ নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি কাজেই আমার সহকর্মীর প্রস্তাব অনুযায়ী অবৈধ সংসদের সদস্যদের উপস্থিতির জন্য নিন্দা প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় এবং ছাত্রী মিছিলে হামলাসহ সন্ত্রাসের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তা হলে আমরা ডাকসু প্রতিনিধিবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানিয়ে অন্তত দু'মিনিটের জন্য হলেও অধিবেশন ত্যাগ করতে বাধ্য হবো।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি তার আগে আপনাকে একটু অনুরোধ করব যে সংসদ সদস্য সম্পর্কে আপনারা যা বললেন সে সম্পর্কে প্রথমত আমাকে আবারো বিধিগত প্রশ্ন তুলতে হয়। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ যার দ্বারা আমরা পরিচালিত হচ্ছি তাতে সিনেটের কম্পোজিশন যদি আপনারা দেখেন তা হলে দেখবেন যে সেখানে সংসদ সদস্য আছে। সে মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় বছর দেড়েক আগে সংসদের মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ জানানো হয় এবং তিনি তাঁর মনোনয়ন দান করেন। তারপর বিধিগত প্রশ্ন যদি আপনি তোলেন তাহলে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান খুলতে হবে। আপনারা জানতে চাইলে আমি তার আর্টিক্যালও বলে দিতে পারি। একজন সংসদ সদস্য সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন কিনা সে প্রশ্নের সমাধান দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত,

ইলেকশন কমিশনের কাছে দরখাস্ত করে সমাধান পাওয়া যেতে পারে যে আদৌ জনাব 'X' সংসদের সদস্য কিনা। তারপর দ্বিতীয়ত স্বয়ং সংসদ অবৈধ কিনা সেটার রায় একমাত্র সুপ্রীমকোর্ট দিতে পারে। আমি দিতে পারি না। এখান থেকে সংসদকে অবৈধ বলার আমার কোনো বিধিগত ক্ষমতা নেই। এটা হবে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এই অসুবিধাগুলো আপনারা Appreciate না করলে আমার জন্যে খুবই মুশকিল। এটা সংবিধানে লেখা আছে, কাজেই আমি কি করতে পারি। সংসদকে অবৈধ ঘোষণা সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত কেউ করতে পারে না। আপনি যদি জানতে চান তা হলে সেই বিধি আপনাকে আমি দেখাতে পারি।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল ঃ মানীয় চেয়ারম্যান, আমার আগে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ এবং মুস্তাক হোসেন যে দু'টি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন আমি মূলত সেই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করব। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ সম্বন্ধে জানি, সে আদেশ বলে ৫ জন জাতীয় সংসদ সদস্যের সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। সেই ক্ষেত্রে এই সংসদ সেটা এখন বহাল আছে তার নির্বাচন সম্পর্কে, এই সংসদে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্পর্কে আমার ধারণা এই সিনেট অধিবেশন, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে এবং তার বাইরে যারা অংশগ্রহণ করছি তাঁদের সবারই জানা আছে। কেবল আমাদের দেশেই নয় এটা সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত যে, যে সংসদ বাংলাদেশে চলছে এ সংসদের নির্বাচন দেশে এবং দেশের বাইরে গোটা দুনিয়ায় প্রশ্নের সম্মুখীন। এ সংসদকে বৈধ সংসদ হিসেবে যেমন আমাদের দেশের ছাত্র এবং জনগণ মনে করে না তেমনি সারা দুনিয়ার মানুষ এ সংসদকে বৈধ সংসদ মনে করে না। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করুক এটা আমরা চাই। কিন্তু যে সংসদ আজকে প্রশ্নের সম্মুখীন, যে সংসদকে বৈধ সংসদ বলার সুযোগ আমাদের নেই, আমাদের দেশের মানুষের নেই, বাইরের দুনিয়ার নেই সে সংসদের পক্ষ থেকে ৫ জন অবৈধ সদস্যের এই সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে বলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ছাত্র প্রতিনিধিরা মনে করি না। আর সে কারণে আমর আগে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ও মুশতাক হোসেন তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং অন্যান্যরা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই সিনেট অধিবেশনে যাঁরা অংশগ্রহণ করছি তাঁদের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। সেটা হলো এই যে ঐ অবৈধ সংসদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে

সিনেট অধিবেশনে বসে আমাদের একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব না হলে কেবল মাত্র ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি না আমরা যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষা করতে চাই, যাঁরা বর্তমান সংসদ সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি পোষণ করি, যাঁদের কাছে বর্তমান সংসদ কখনোই বৈধতা পায়নি তাঁদের সকলের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলে সে কারণে, সে প্রতিবাদে আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে একযোগে এ সিনেট অধিবেশন থেকে Walk out করার জন্য।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এবার সেখ মোস্তাফা ফারুক।

জনাব সেখ মোস্তাফা ফারুক ঃ মাননীয় সভাপতি ইতিমধ্যেই আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে, যে পটভূমিতে এই সিনেট অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে সে পটভূমিতে এ অধিবেশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনার জন্য এ সিনেট দীর্ঘদিন অকার্যকর করে রাখার জন্য যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের শিক্ষকসমাজ যেরূপ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেরূপ আমরা ছাত্রসমাজও প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবির মুখে এবং আকাঙ্ক্ষার অংশ হিসেবে আজকের এ সিনেট সভা বসতে যাচ্ছে। এ সিনেট সভা বসার শুরুতেই ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষে যে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে সেটাকে মাননীয় সভাপতি আইনগত ব্যাখ্যা দিয়ে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটা আমাদের কাছে একটা বিবেকের দায়। কারণ আমরা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ গত ৭/৮ বছর যাবৎ একটা সামরিক জান্তা যারা অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তাঁরা দেশের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করে দিয়ে দেশে একটা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে চেয়েছেন। আজ সেই স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাদের জাফর, জয়নাল ও মোজাম্মেল সহ অসংখ্য ছাত্রবন্ধু শহীদ হয়েছে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেলিম, রাউফুন বসুনিয়া, দেলোয়ার সহ অসংখ্য ছাত্রবন্ধু শহীদ হয়েছেন। স্বৈরাচারী শাসনের মুল নীল নক্সা পরিকল্পনায় স্বৈরাচারী শাসনকে বৈধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ Point of order এ দাঁড়িয়ে কি এত কথা বলা যায় মাননীয় সদস্য?

জনাব সেখ মোস্তফা ফারুক ঃ তাহলে মাননীয় সভাপতি আমরা আমাদের বিবেকের দায়ে, বিবেকের তাড়নায়, নৈতিকভাবে এই সংসদের বৈধতা মানতে পারি

না। তাঁদের প্রতিনিধিদের এখানে উপস্থিতিও আমরা মানতে পারি না। সেই বিবেকের তাড়নায় আমরা ছাত্র প্রতিনিধিরা এই হাউসকে দুই মিনেটের জন্য বয়কট করতে চেয়েছি। দু'মিনিটের জন্য অধিবেশন থেকে Walk out করতে চেয়েছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বিবেকের পীড়ন থেকে মুক্তি চাই। আমরা চাই সিনেট অধিবেশন চলুক। সিনেটের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলুক। তবে আমাদের বিবেকের তাড়না থেকে এই অধিবেশন কক্ষ দুই মিনিটের জন্য বয়কট করতে চাচ্ছি।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় সভাপতি, আপনি বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী এই সিনেটে পাঁচজন সংসদ সদস্য আসবেন এ সম্পর্কে আমাদের কোনো বিরোধিতা নেই। এটি ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে রয়েছে, এটি আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু সম্মানিত সভাপতি আপনি যখন এ চেয়ারে ছিলেন না তখন আপনি শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে ১৯৮৮ সালে তথাকথিত ভুয়া নির্বাচনের পর আপনি সেদিন এ সংসদকে একটি ভুয়া সংসদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কাজেই সম্মানিত সভাপতি আমার মনে হয় আজকে সুযোগ এসেছে আপনি ১৯৮৮ সালে যে কথা বলেছিলেন সে কথাটিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব এখন আপনার, কারণ আপনি আজ সিনেটের সভাপতি হিসেবে এখানে বসেছেন। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে আহ্বান জানাব, অনুরোধ করব, আমরা এখানে সংবিধানের কোনো বিরোধিতা করছি না তবে বর্তমান সরকারের যে সংসদ সে সংসদ বৈধ সংসদ নয় বলে ঘোষণা করার। জাতি যখন এটাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নি, আমরা স্বীকার করি নি, আপনিও বিবৃতি দিয়ে সেদিন স্বীকার করেন নি কাজেই আপনাকে অনুরোধ করব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন সিনেট সদস্যদের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য। আর তা না হলে স্বাভাবিক কারণে দু'মিনেটে জন্য হলেও আমরা অধিবেশন ত্যাগ করব, ধন্যবাদ।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখ সহকারে আপনাকে জানাচ্ছি যে সংবিধান বিরোধী কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে আমি পারব না, এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান তাহলে আমরা দু'মিনিটের জন্য Walk out করতে বাধ্য হচ্ছি।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদেরকে আবারো বলবো বিষয়টি আলোচনা সুযোগ দেয়ার জন্য। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, সংবিধানের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারবেন না। আমার মনে হয় আপনি এখানে একটা ভুল সিদ্ধান্তের কথা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। কারণ সংবিধানে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেই যে

আপনি নিন্দা প্রস্তাব নিতে পারবেন না। আমি ছাত্রবন্ধুদেরকে আবারো অনুরোধ করছি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য। সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। প্রথম যে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছিল সেটার ওপর যদি সিদ্ধান্ত নেই তারপর পরবর্তী প্রস্তাবে আসি, সে কথা আমি আগেও বলেছি তা হলে সুবিধা হয়।

প্রস্তাব একটা করা হয়েছে। সেটা সমর্থিত হয়েছে। আপনি নিজেও বলেছেন যে এটা নিন্দনীয় বিষয়। কাজেই সে সম্বন্ধে আপনি সিদ্ধান্ত দিন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেট সদস্য যদি রাজি থাকেন যে এ নিন্দা প্রস্তাব এখানে গ্রহণ করা যায় তাহলে সে নিন্দাপ্রস্তাব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। সে মর্মে পরবর্তীতে আর একটি যে প্রস্তাব এসেছে সেটাও আপনি সেভাবে গ্রহণ করে দেখতে পারেন তাতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য যদি সেটা গ্রহণ করতে চায় তা হলে সেটাও আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। এতে সংবিধান পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ দ্বিতীয় বিষয় যেটি সেটা বুঝে দেখতে হবে। সংসদকে অবৈধ ঘোষণা করা—এ সম্পর্কে আপনারা চাইলে সংবিধান থেকে আমি পড়ে আপনাদের শোনাতে পারি।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি Point of order এ বলছি, আমি দুই মিনিট কথা বলতে চাই। চেয়ারম্যান সাহেব আপনি কথাটি এভাবে এখানে উত্থাপন করছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট বাংলাদেশের আইন পরিষদ আইন সঙ্গত কি না সেই বিষয়ে রায় দিবে। আসলে প্রশ্নটা তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কোর্ট নয়, কাছারিও নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এই ধরনের কোনো দায়িত্ব নেই, অধিকার নেই, আইন সঙ্গত কোনো অধিকার নেই। এটা আমরা স্পষ্ট বুঝি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেক। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো বাংলাদেশের বিবেক।

এই কথাটি এই সিনেটে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আপনি যখন ঐ চেয়ারটিতে বসেননি তখন কিন্তু একই কথা আপনিও বলেছেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ হয়তো মাঠে বলেছি, এখানে নয়।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাঠে নয়, এই সিনেটে বলেছেন। সিনেটের আক্ষরিক রেকর্ড যদি আপনি খোলেন তা হলে এটা দেখবেন। আমার দুঃখ হলো এই যে, দুনিয়াটা এমনিই যে ক্ষমতা এমন একটি জিনিস ... ...

জনাব চেয়ারম্যান ঃ দয়া করে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আনবেন না।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ ব্যক্তিগত নয়, আপনার কথা বলছি না। ক্ষমতাটা এমনিই যে সিংহাসন বা আসনের জন্য লোক নীতি বিসর্জন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা

করে না। চেয়ারম্যান সাহেব, আমার দুঃখ শুধু এখানে, একটি নীতির ক্ষেত্রে যে ছাত্রীদের ওপর হামলা করা হয়েছে বা সন্ত্রাস করা হয়েছে তা শুধু নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা জাতির বিবেক হিসেবে এটাও লক্ষ করে যে সন্ত্রাস শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় সারা বাংলাদেশে বিদ্যমান। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা প্রয়োজন। এখানে আইনের হুকুম দেয়ার কথা নয়, বিবেকের কথা উচ্চারিত হবে এবং তা করা উচিৎ, আমরা করতে চাই। আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরো বলতে চাই এ কারণে যে, দেশে রাস্ট্রীয় ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে, সূক্ষ্মভাবে হস্তান্তরিত হতে যে পারছে না তা বাংলাদেশের জন্য চরম লজ্জার কারণ হয়েছে। এমন একটি দেশ বাংলাদেশ যেখানে রাস্ট্রীয় ক্ষমতা কোনো আইন সঙ্গতভাবে হস্তান্তরিত হয় না। একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাও আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তরিত হচ্ছে না। সন্ত্রাসের মুখে আপনি যখন অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন তখনকার কথা চিন্তা করে দেখুন কি রকম একটি সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতি এখানে ছিল। আপনার পূর্বে অধ্যাপক আবদুল মান্নান সাহেব যখন এখানে উপাচার্য হয়েছিলেন তখনকার কথা চিন্তা করে দেখুন কি রকম সন্ত্রাসের মুখে তিনি এখানে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ ঘটনার বিভিন্ন দৃশ্যপটগুলি তুলনীয় নয়। আপনি নিজেও জানেন, আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে এটা জানেন। আমি আপনাকে এবং সকল সদস্যকে অনুরোধ করব যে Point of order কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। আমরা পার্লামেন্টের প্র্যাক্টিসের কথাই বলছি। Point of order হচ্ছে 'বৈধতার প্রশ্ন'। কার্যসূচির একটি আইটেম যদি বৈধ না হয় কিংবা চেয়ারম্যান যদি অবৈধভাবে কোনো কাজ করেন তখন সেগুলো সম্পর্কে Point of order তোলা যায়। আসলে বিষয়টি এই কিন্তু আমরা এই Point of order বলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছি আমার মনে হয়, এটি Point of order এর উদ্দেশ্যও নয়, ব্যাখ্যাও নয়। তাই আমি অনুরোধ করব যে আপনারা কোনটা চান সেটা স্পষ্ট বললে সে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করতে পারি।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি Point of order এ আগে বলেছিলাম। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এখন আমি বক্তৃতা দিচ্ছি তা আপনার অনুমতি নিয়ে। এর আগে আমি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলাম। তখন বক্তৃতা দেইনি। এই মুহূর্তে আমি কিন্তু Point of order-এ কিছু বলছি না। আমি বক্তব্য পেশ করছি। আমি আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্য, আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে অভিজ্ঞ তাঁদের একজন। কাজেই সিনেটের

কার্যক্রমের সঙ্গে আপনি অত্যন্ত পরিচিত। আপনি জানেন যে বিশেষ সভার যে একটি আলোচ্যসূচি রয়েছে সেটা আমরা আলোচনা না করে, সমাধান না করে অন্য কিছুতে গেলে আমাদের কি কি অসুবিধা হতে পারে তা-ও আপনি নিশ্চয় জানেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব আমাদের যে আলোচ্যসূচিটি আছে সেখানে আমরা ফিরে আসি। আমরা সেটা শেষ করি। এরপরে যদি আলোচনা আরো থাকে সদস্যরা চাইলে সেটা করা যেতে পারে। সেটা আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি। আমি না করিনি কিন্তু। আমি বলেছিলাম কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতকগুলো বিধিগত অসুবিধা রয়েছে। আর পার্লামেন্টের বৈধতা সম্পর্কে যা আমি বলেছিলাম সেটা কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়, দেশের সংবিধান অনুযায়ী সেটাকে অবৈধ বলতে পারব না। যদিও আমরা বিবেক বলে বলতে পারি কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা বলা যায় না।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমাকে যদি কথাগুলো বলতে দিতেন তা হলে এ ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো না। আমরা প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এবং আপনাকে অনুরোধ করছি এ প্রস্তাব দু'টো গ্রহণ করার জন্য। এ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং বিধিগতভাবে ছাত্র এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সমর্থন করা হয়েছে। আপনি এখন রুলিং দিন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনি দ্বিতীয়টি সম্পর্কে যদি বলেন তা হলে আমি সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছি। তবে প্রথমটি আলোচিত হতে পারে যেহেতু সেটি সাংবিধানিক বিষয় নয়। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আমার Positive reservation রয়েছে। কারণ এটি দেশের সংবিধান পরিপন্থী, যা আমি করতে চাইবো না।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমরা ছাত্রী মিছিলে হামলা প্রস্তাবটি শোক প্রস্তাবের সঙ্গেই নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ কোনো বিশেষ অধিবেশনে শোক প্রস্তাব ছাড়া এবং যে আইটেম দেয়া হয় তা ছাড়া অন্য আইটেম আলোচনা করা হয় না। আপনি সবগুলো কার্যবিবরণী দেখতে পারেন। কোনো বিশেষ অধিবেশনে এ নজির নেই।

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান নিন্দা প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমার একটু বক্তব্য রয়েছে। আমি অনেকবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আপনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি বলতে চাচ্ছিলাম ছাত্রবন্ধুগণ যে প্রস্তাব করেছে ছাত্রী মিছিলের উপর হামলার এবং সকল সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা করার জন্য সে প্রেক্ষিতে যদি আপনি বিধির কথা বলেন তা হলে বিধিগতভাবে হয়তো এটা কার্যসূচির অন্তর্ভূক্ত না করে আলোচনা করা যায় না এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না একথা সত্য। তবে আমরা অতীতেও এই সিনেট

রেগুলেশনস্‌কে By pass করে এ ধরনের নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছি। ফলে আমি বলছি যে, যেটাতে সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত সেটা নয়, সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা প্রস্তাব অতীতেও আমরা নিয়েছি। ছাত্রী মিছিলের ওপর হামলা এবং সকল সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা প্রস্তাব আমরা এখান থেকে নিতে পারি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ কেন আমি নিতে পারছি না সেটা যদি আপনি জানতে চান তা হলে আমি বলতে পারি। আপনি কি দয়া করে শুনতে চাইবেন তা? আপনি দয়া করে বসুন। আর একজনকে বলতে দিন।

ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী ঃ মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সিনেট সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ, আজকে যে পরিবেশ এখানে দেখছি তা হলো এই যে একটা নিন্দা প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ যাতে সুষ্ঠু থাকে তার জন্যে আমরা চেষ্টা করছি। পরিবেশ যেন এখানে সুন্দর হয় সেটার চেষ্টা করছি। শিক্ষার পরিবেশ যদি আমরা সুষ্ঠু করতে চাই তাহলে সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে আমাদের নিন্দা করতে হবে। কাজেই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য যে-কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হোক সেটাকে নিন্দা করা। এটা যদি আমরা না করি তা হলে আমার মনে হয় সিনেট সদস্য হিসেবে আমরা আমাদের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবো না এই বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং মাননীয় উপাচার্যকে অনুরোধ করছি এই নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য। এটা By pass করা নয়, এটা সাধারণভাবে একটা নিন্দা প্রস্তাব আমরা করতে পারি। জাতীয় পর্যায়েও যে-কোনো নিন্দা প্রস্তাব আমরা করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর করার জন্য। ধন্যবাদ।

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ঃ মাননীয় সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, সম্মানিত সিনেট সদস্য যে কথাটি বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে আমি একমত এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা ঐ ঘটনার নিন্দা করেছি। আমি মিনিট খানেকের মধ্যে আমার বক্তব্য সমাপ্তির চেষ্টা করব। মোটামুটিভাবে বিদগ্ধ সমাজে এই ধারণা অত্যন্ত জনপ্রিয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কোনো IVORY TOWER নয়। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটবে তার ঢেউ এখানে এসে লাগবে। আমি এই ধারণা থেকে একটু ভিন্নমত পোষণ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে সাত শো বিঘা বা আড়াইশো একর জমির উপর। দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য প্রায় এক হাজার শিক্ষক রয়েছেন এ এলাকায়। প্রায় ২৫/২৬ হাজার ছাত্রছাত্রী এখানে ভর্তি হয়। তাঁরাও দেশের সেরা ছাত্রছাত্রী, দেশের সেরা সন্তান। আমাদের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম বারে বারে

হোঁচট খাচ্ছে। বর্তমানে সমাজের অন্যান্যদের মতো আমরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে চলেছি। বারে বারে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম হোঁচট খাচ্ছে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আমার দ্বি-মত নেই। যে ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রমই হোক না কেন তা নিন্দনীয় এবং আমরা নিন্দা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত। এখন বিধিগতভাবে সেটা যদি না হয় তাহলেও Declaratory একটা প্রস্তাব এখানে থেকে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তা স্বচ্ছন্দে নিতে পারি। ছাত্রী মিছিলে হামলা এবং তার আগে পরে যে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির ক্ষুণ্ন করেছে এই কাজকর্মকে আমরা ভালো চোখে কোনো সময় দেখি না এবং দেখার প্রয়োজনও নেই। সুতরাং আমি মাননীয় সভাপতিকে অনুরোধ করব বিধিগতভাবে যদি কোনো অসুবিধা থেকেও থাকে তা হলে অন্তত Declaratory এটা সিদ্ধান্ত আমাদের থাকবে। নিশ্চয়ই আমরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে না-পছন্দ করি, সাংঘাতিক রকম ঘৃণা করি। এখানে পাঁচজন সংসদ সদস্য আসার কথা, তন্মধ্যে সম্ভবত চারজন এসেছেন। এই ব্যাপারে আমি আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকতুল্য এবং বিবেকপ্রতীক এই যে সিনেট তার কাছে আমাদের আশু যে কর্তব্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে অধিবেশন ডাকা হয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধান কল্পে আমি অনুরোধ করব সম্মানীয় ৫ জন সদস্য যে প্রস্তাব করেছেন তা আইনের প্রতিষ্ঠানের আওতায় কতটুকু আসে আমার জানা নেই। জাতীয় সংসদ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তারই প্রণীত আইন-কানুন দ্বারাই আমরা পরিচালিত হচ্ছি। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। ঐ ব্যাপারে কথাটা বলতে আমার খুব সঙ্কোচবোধ হয় অন্তত যেহেতু তাঁরা এ সভায় উপস্থিত আছেন সেহেতু আর কথা না বাড়িয়ে আমি অনুরোধ করব, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাদের আশু লক্ষ্যটি অর্জিত হোক এবং তাঁরা আমাদের ঐ ব্যাপারে সহায়তা দিন।

জনাব এস.এম.কামাল হোসেন ঃ মাননীয় সভাপতি আমাদের প্রতিনিধি মুশতাক হোসেন প্রস্তাব করেছেন ছাত্রী মিছিলে হামলার জন্য নিন্দা প্রস্তাব নিতে। আর একটা প্রস্তাব আমাদের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে ৫ জন সংসদ সদস্য সম্বন্ধে। আমরা যেটাকে ভোটারবিহীন সংসদ বলি, ভোট ডাকাতের সংসদ বলি, সেই ডাকাত সংসদ সদস্যগণ এই পবিত্র অঙ্গনে উপস্থিত। আমরা এ দু'টো নিন্দা প্রস্তাব নেয়ার জন্য প্রস্তাব রেখেছি। আপনি চেয়ার থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন। আপনি যদি মনে করেন ছাত্রীমিছিলে হামলার নিন্দা প্রস্তাব না নেয়া উচিৎ তাহলে রুলিং দিন। তারপর সংসদের ৫ জন সদস্য সম্বন্ধে যদি আপনি মনে করেন নিন্দা প্রস্তাব নেয়া যায় না তাহলে রুলিং দিতে পারেন। কিন্তু আমরা আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য চাচ্ছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে আগে বলি অর্থাৎ সংসদ সম্পর্কে। এটি যেহেতু সাংবিধানিক ব্যাপার সে জন্য উপাচার্যের মত একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে সংবিধান বিরোধী কোনো রকম সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারব না এই আমার রুলিং। তারপর প্রথম যে প্রস্তাব করা হয়েছে তারও বিধিগত কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু সেটি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটা দেশের সংবিধানের সঙ্গে কোনো সম্পর্কযুক্ত নয়। যদিও সংবিধানে একটি কথা রয়েছে যে কোনো বিচারাধীন বা তদন্তাধীন বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া যায় না, তবু আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। এটা যদি হাউস মনে করে যে আজকের বিশেষ অধিবেশন যে জন্য ডাকা হয়েছে সে বিজনেস ট্রানজেক্ট করার পর ওটি আলোচনা করব এটাই যদি এগ্রিমেন্ট হয় আমার আলোচনা করতে তাহলে আপত্তি নেই।

ড. এ.কে. আজাদ চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, বিধির প্রশ্নে কিন্তু মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। আপনি একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, অন্য একজন সিনেট সদস্য আর একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সিনেট সদস্যই মত প্রকাশ করেছেন। বিধির প্রশ্ন তুলে, বৈধতার প্রশ্ন তুলে বিবেকের তাড়নাকে উপেক্ষা করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব ব্যাপার। সে জন্য ছাত্রী মিছিলের হামলার ব্যাপারটা নিন্দনীয়। আমার মনে হয় এ নিন্দা প্রকাশ করার সাথে, শোক প্রস্তাব যদি পাস করা যায়, তার সঙ্গে এরূপ একটা জঘন্য নারকীয় ঘটনার নিন্দা করা যাবে না তা নয়। কারণ মরদেহ যখন সর্বত্র থেকেই যায় তখন এটাও মরার পাশাপাশি ছিল। সে রকম নারকীয় ঘটনার নিন্দা করতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নে সংবিধানের প্রশ্ন তুলেছেন। সংবিধানে যে কাজটি আছে আর তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারব কি পারব না সে প্রশ্ন তুলেছেন। সুপ্রীম কোর্ট করতে পারে। সে কথা বলেছেন। জাতীয় সংসদ করতে পারে সে কথাও বলেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট তখন দেশে মার্শাল'ল ছিল আমার মনে আছে, সামরিক আইন তো দেশের সর্বোচ্চ আইন, তখনো তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। সেটা কি বৈধ ছিল? তখন সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করা হয়েছিল সেটা কি বৈধ ছিল? কাজেই সেই বৈধতার প্রশ্ন তুলে বিবেককে গলা টিপে মারবেন না। ছাত্ররা যে দাবি তুলেছে, আমি তাদের অপর প্রস্তাবও সমর্থন করি। ভোটারহীন সংসদের যাঁরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন যদিও বিধিগতভাবে তাঁরা ভোটার কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে তাঁদের Moral Right-এর দিক থেকে তাঁরা ভোটার কিনা সে প্রশ্ন তাঁদের বিবেকের কাছে আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে চাই। জাতি যেখানে জানে শতকরা ৩ জনও ভোট দেয় নি। দেশ-বিদেশ সবাই জানে

ভোট হয়নি। এমনকি রাষ্ট্রপতিও বলেছেন আমরা এই সংসদকে ভেঙ্গে দিয়ে আগেই নির্বাচন করতে পারি। একথা তিনি স্বীকার করেছেন। Donor Agency বলেছেন। তা হলে ভূতের মুখে রাম নাম সবাই যখন নিতে পারে তখন আমাদের নিতে আপত্তি কি? এটাই আমার বক্তব্য।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আপনি কি আমাদের প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করছেন?

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এই শর্তে যে আমাদের যে কার্যসূচি রয়েছে সেটি শেষ করার পর আমরা অন্যান্য বিষয়ে যেতে পারি।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

জনাব চেয়ারম্যান ঃ দ্বিতীয় প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারব না যেহেতু এটা সংবিধান বিরোধী।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আপনি যে কথা বলে এটা রুল আউট করছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। আপনি বলছেন সংবিধান বিরোধী বলে আপনি রুল আউট করছেন এ কথা আপনি বলতে পারেন না বলে আমি মনে করি। আপনি রুল আউট করতে পারেন সে ক্ষমতা আপনার আছে। ঐ চেয়ারে বসে আপনি রুল আউট করতে পারেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি আমার Discretion ব্যবহার করে রুল আউট করছি না।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ আপনি আপনার Discretion use করে Ruled করুন। কিন্তু সংবিধান দেখিয়ে আপনি Ruled out করবেন না। প্রস্তাবটা কি দেয়া হয়েছে? প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ভোটারবিহীন সংসদ যেটা হয়েছে সেই সংসদের সদস্যদের উপস্থিতি আমরা এখানে গ্রহণ করি না। এই যদি প্রস্তাব হয়ে থাকে তা হলে সে প্রস্তাবের সঙ্গে সংবিধান লংঘনের কোনো প্রস্তাব নেই।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ সংসদের সংবিধান লংঘনের প্রশ্ন এখানে যা আপনাকে বহুবার বলেছি। আপনি যদি সংবিধানের বিধান শুনতে চান তা হলে আমি আপনাকে তা পড়ে শুনাতে পারি। জাতীয় সংসদকে বেআইনি ঘোষণা করতে পারে একমাত্র সুপ্রীম কোর্ট, আমি পারি না।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ এখানে মাননীয় ছাত্র প্রতিনিধি পার্লামেন্টকে অবৈধ ঘোষণা করার কোনো প্রস্তাব আনেন নি।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, যেহেতু ছাত্রী মিছিলে হামলার জন্য নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে না এবং যেহেতু ভোট-

বিহীন অবৈধ পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের সিনেটে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে না যদিও ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার এটাকে নিন্দা করেছিল। এবং যেহেতু বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার এতদিন পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটকে কার্যকর করতে দেয়নি সেহেতু আমি বলছিলাম, মাননীয় চেয়ারম্যান আপনি যখন এই চেয়ারে বসেননি তখন আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সজাগ শিক্ষক হিসাবে এ সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে ভুয়া সংসদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অথচ আজকে আপনি সেটা গ্রহণ করছেন না। কাজেই আমরা বলতেচাচ্ছি যে অবৈধ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে আমরা তাঁদের সম্পর্কে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ তাঁদের উপস্থিতিতে আমাদের এই অধিবেশনের ভাবমূর্তি ও সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। কাজেই আমরা আপনার কাছ থেকে সুস্পষ্ট রুলিং দাবি করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি তো বলেছিই আমি এটা করতে পারব না।

চেয়ারম্যানের রুলিং

জনাব চেয়ারম্যান, এই মর্মে রুলিং প্রদান করেন যে সিনেটের সদস্য হিসাবে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদ সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাব সাংবিধানিক কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে আলোচিত বা গৃহীত হতে পারে না।

জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঃ তাহলে মাননীয় চেয়ারম্যান আমরা ডাকসুর প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদে দু'মিনিটের জন্য সিনেট অধিবেশন বর্জন করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনারা চলে যাওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত তবে আমি আশা করব যে দুই মিনিট পর আপনারা আবার হাউসে ফিরে আসবেন।

জনাব চেয়ারম্যানের উল্লেখিত রুলিং এর প্রতিবাদে ডাকসু কর্তৃক মনোনীত নিম্নলিখিত পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি দুই মিনিটের জন্য সিনেট অধিবেশন বর্জন করেন ঃ

১। জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ।

২। জনাব মুশতাক হোসেন।

৩। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

৪। সেখ মোস্তাফা ফারুক

৫। জনাব এস,এম,কামাল হোসেন।

মিসেস আফরোজান নাহার রাশেদা ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান আমরা যাঁরা সিনেট সদস্য এখানে উপস্থিত আছি, আমি ছোট একটা প্রশ্ন করতে চাই, আমরা কি অন্ধ না বিবেকহীন? বিবেকের কাছে, চোখের কাছে আমরা নতি স্বীকার করি।

আমরা চোখে যা দেখেছিলাম, ছাত্রী মিছিলে হামলা অর্থাৎ যে সম্বন্ধে ডাকসু নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, অনেক শিক্ষকও বলেছেন সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। আর আমি মনে করছি আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি আমাদের কার্যসূচিতে আসার জন্য। এ কথা অনেকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। যদি ভোটাভুটি করা যায় অথবা হাত তুলতে বলা হয় তাহলে তার মাধ্যমে খুব সংক্ষেপে এ কাজ সমাধা করে অর্থাৎ নিন্দা প্রস্তাব নেয়া যাবে কি যাবে না সে প্রশ্নের সমাধান করে আমরা আসল কার্যসূচিতে চলে যাই।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি সে কথা বলেছি মাননীয় সদস্য। আমরা যদি এইটি স্বীকার করে নেই যে আমাদের যে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি আছে সেটি আমরা আগে সেরে নেই তারপরে আমরা এ বিষয়টিতে যেতে পারব। তাতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমিতো বলছি যে হাউস যখন এটা চাচ্ছে তখন হাউসের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে চাচ্ছি না।

ড. ম. আখতারুজ্জামান ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনার এই অগণতান্ত্রিক বেআইনি রুলিং দেয়ার জন্য প্রতিবাদ করছি। আমিও দুই মিনিটের জন্য ওয়াক-আউট করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এ ধরনের কথা ব্যবহার করবেন না দয়া করে। আপনি যদি চলে যান তাহলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো। আজকে হয়তো আমরা টেবিলের এপাশে ওপাশে বসেছি কিন্তু আপনি জানেন আমি আপনার অনেক দিনের ব্যক্তিগত বন্ধু। আপনি চলে গেলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ মাননীয় সভাপতি আপনিও দুঃখ প্রকাশ করছেন আমরাও দুঃখ প্রকাশ করছি। অনেক দিন সিনেট অধিবেশন হয়েছে তাতে কোনো ছাত্র প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৮২ সাল থেকে ডাকসু বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাঁরা গত বছর নির্বাচিত হয়ে এই প্রথমবারের মত সিনেটে বসেছে। তাঁরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দু'টি প্রস্তাব রেখেছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ড. মোহাম্মদ মশিহুজ্জামান ঃ এখানে বসে আমার এইজন্য দুঃখ লাগছে আপনার জন্য যে, আপনি ওখানে বসে বলছেন আপনি মাঠে এক রকম কথা বলেন এবং চেয়ারে বসে আর এক রকম কথা বলেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে আমাকে এই কথা শুনতে হলো যে তিনি বাইরে এক রকম কথা বলেন, আর ভিতরে আর এক রকম কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি এতে লজ্জা পাচ্ছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্য আপনি জানেন সিনেট অধিবেশনে

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা বলা যায় না। আমি ধৈর্য ধরে আপনাদের সব কথা শুনতে রাজি আছি কিন্তু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দয়া করে আনবেন না। আর তা ছাড়া আমার অবস্থানের অপব্যাখ্যাও করা হচ্ছে।

জনাব মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিঞা ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি আপনাকে অনুরোধ করব কেউ যেন চেয়ারম্যানকে বা অন্য কোনো সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে অপমান না করেন। ধন্যবাদ।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি একটু সাংবিধানিক বিষয়ের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে বিষয়টি আপনি শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদেরকে বলেছেন সে বিষয়টি আমার কাছে একটু আইন বিরোধী বলে মনে হয়েছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ কোন বিষয়টি আপনি উল্লেখ করুন।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ বিষয়টি হচ্ছে সংসদের সদস্যরা—।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমার মনে হয় সে বিষয়ে আমি রুলিং দিয়েছি। কাজেই মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব এ বিষয়ে আর আলোচনা না করতে, এটা শেষ হয়ে গেছে।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ তা হলে আমিও এর প্রতিবাদে দু'মিনিটের জন্য Walk out করতে বাধ্য হচ্ছি।

অতঃপর জনাব চেয়ারম্যানের উল্লেখিত রুলিং-এর প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ দুই মিনেটের জন্য সিনেট অধিবেশন বর্জন করেন ঃ—

১। অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান

২। অধ্যাপক কে.এ.এম. সাদউদ্দিন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি তাতে খুব দুঃখিত হবো। আপনি ফিরে এলে আমি খুশি হতাম।

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে অবশেষে আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না যে আমার দৃষ্টি খুব সংকীর্ণ।

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ আপনি যেহেতু চশমা ব্যবহার করছেন না সেহেতু বলছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমার চশমাটি কেবল রিডিং গ্লাস।

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ আমারটাও অনেকটা তাই। শিক্ষক হিসেবে আমার মনে হয় এখানে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে অন্তত পক্ষে। আমি যে কথা বলতে

চাচ্ছিলাম, মাননীয় সভাপতি সেটা হলো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটা বিশেষ অবস্থায় আপনি এই বিশেষ সভার ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম বহুদিন আগে। সেটা যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে নিজেকে সিনেটর বলে ধন্যবাদ জানিয়েছি কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে সিনেট সভা থেকে বহু দূরে ছিলাম। এটা আমার বেলায় যতটুকু সত্য, এখনকার সকল সদস্যের বেলায়ও সেটা প্রযোজ্য। তারপর দীর্ঘদিন পরে আজকে যখন আমরা সিনেটের সভায় উপস্থিত হয়েছি এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে আমাদের অনেক রাগ-অনুরাগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা সব জমে আছে। আজকে সে বেদনারই একটা বেদনা ছিল দীর্ঘদিন আগে অনুষ্ঠিত ছাত্রী মিছিলের উপর হামলার কথা। এ কথা ছাত্র প্রতিনিধিরা উত্থাপন করেছেন। শিক্ষক প্রতিনিধিদের কেউ কেউ এটাকে সমর্থন করেছেন। আর আমরা যাঁরা সমর্থন করার সুযোগ পাইনি তাঁরাও সমর্থন করেছেন। এ ছাড়াও জাতীয় সংসদ সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে। আমার ধারণা যদি আপনার অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে এর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অনেকগুলো কথা বেদনাকারে আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারি। সেটা প্রকাশ করার বিধিগত ব্যাপারে কোনো অসুবিধা থাকলেও অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করছি, আমরা যে বিদ্যার চর্চা করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণের সঙ্গে কোনো আলোচনা আইন পরিপন্থী এটা বলা আমার মনে হয় সঙ্গত নয়। এর আগেও আমি দু'বার সিনেট সদস্য ছিলাম। আমরা যেটা উত্থাপন করি সেটা আলোচিত হওয়ার পর সেটাকে আইন পরিপন্থী বলে বাইরে নিন্দা করা হবে বলে বাদ দেয়া পূর্বে কখনো হয়নি। সে জন্য আমি বলবো এমন পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয়। আপনি নিজেও প্রথমত একজন অধ্যাপক। তারপর উপাচার্য। আমরাও এখানে অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত। এমন পরিস্থিতি যেন বাইরে না হয়, 'দেওয়ালের কান আছে' মাননীয় উপাচার্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিনেট সদস্যদের মধ্যে বিধিগত ব্যাপারে একটা বড় রকমের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা মনে করি আসলে এখানে কোনো বিভেদ নেই। আপনিও জানেন বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত একটা স্পর্শকাতর স্থান। এখানকার মান-মর্যাদার পরিপন্থী অনেক কিছু করার জন্য অনেকে ওঁত পেতে আছেন। সে জন্য আমি মনে করি আপনি ও আমরা সবাই মিলে কতকগুলো ব্যাপারে, অন্তত নিন্দা করার ব্যাপারে যেটা আমার ভালো লাগে না, যাকে আমি ভালোবাসি না তাকে ভালোবাসিনী বললে কোনো আইনগত বাধা নেই। Laws of hatred are purely emotional matter—মাননীয় উপাচার্য।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ I wish i could share your feelings.

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ I hope dates are not yet over sir, any time it

may hapen sir, সে জন্য আমি বলি যে আমরা ঐ জিনিসটাকে পছন্দ করি না এ কথাটা বললে এর মধ্যে কোনো আইনগত বাধা নেই। যদি আইনগত বিধির কথা ওঠান মাননীয় উপাচার্য, তাহলে আজকের এই বিশেষ সভায় চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা বা করা যাবে কিনা এটাতেও বোধ হয় আইনগত বাধা হতে পারে। কারণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা চা পাইনি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি আপনাদের সামনে একটি প্রস্তাব রাখছি। একটি বিষয় দেখা যাচ্ছে অনেক মাননীয় সদস্যই এই ছাত্রী মিছিলে হামলার বিষয়টি আলোচনা করতে চান অথবা তার উপর প্রস্তাব নিতে চান। এটাই যদি হয় তাহলে আমি যদিও মনে করি যে বিধিগতভাবে সঠিক নয় কিন্তু সে রিজার্ভেশন রেখেও প্রস্তাব আমি নিতে রাজি আছি এ শর্তে যে তারপরে আমরা আমাদের আলোচ্যসূচিতে যাবো। এতে কি আপনারা রাজি আছেন?

ড. আলোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ঃ আমার প্রস্তাবটিও তাই ছিল মাননীয় চেয়ারম্যান।

(জনাব চেয়ারম্যানের উপরোক্ত প্রস্তাবে মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন)

জনাব চেয়ারম্যান ঃ যদি তাই হাউসের মত হয় তা হলে আমরা ছাত্রী মিছিলের উপর হামলার বিষয়টি সম্বন্ধে বিধিগত ব্যাপারে আমার রিজার্ভেশন থাকা সত্ত্বেও হাউস চাচ্ছে বলে আমি তার উপর প্রস্তাব নিতে রাজি আছি। Provided right after that we go for tea for five or ten minutes and then we go for the item on the agenda. Is that o.k ?

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ আমার কথাটি কিন্তু শেষ হয়নি মাননীয় চেয়ারম্যান। আমি সসম্মানে এখন বক্তৃতা মঞ্চ ত্যাগ করতে চাচ্ছি। আমি মাত্র ১ মিনিট বলবো। তারপরও আমার বলার অনেক কিছু থাকবে। ছাত্রী মিছিলের ওপর হামলা তথা এবং তার সাথে আর একটা বিষয় সংশ্লিষ্ট। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি যে এক বেদনাদায়ক অবস্থায় আছি, সেটা বলা যায় না কিন্তু সহ্য করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী মিছিলের ওপর হামলা একটা উপসর্গ মাত্র। এটা General and specific, specific outburst of a general symptom. সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক আছি। আমাদের এখানে নানারকম সন্ত্রাস হচ্ছে এবং হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত হচ্ছে। যা দেখা যাচ্ছে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যার Interval short হয়ে আসছে। এই বিষয়, এই যে ঘটনাগুলো এর জন্য আমরা Civilia কমিটি করেছি। একটা জিনিস যেটা আমি বেদনার সাথে লক্ষ করেছি সেটা হলো এই এখানে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হয় এমনকি হত্যা

সংঘটিত হয়ে সেটার সরকারি তরফ থেকে কোনো রকম উদ্যোগ করা হয় না বিচার এবং সমুচিত শাস্তির জন্য—এ ব্যাপারে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারি বলে আমি মনে করি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমরা এটা গ্রহণ করেছি অধ্যাপক ইসলাম।

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সব রকমের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিচার এবং তার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ করা যেতে পারে এই শর্তে যে আমরা এরপর পরই কার্যসূচির আইটেমে যাবো।

ড. আমিনুল ইসলাম ঃ ধন্যবাদ, মাননীয় চেয়ারম্যান।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ ধন্যবাদ।

ছাত্রী মিছিলে হামলার নিন্দা

সিদ্ধান্ত

অতঃপর জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ কর্তৃক উত্থাপিত ও ড. আমিনুল ইসলাম কর্তৃক সংশোধিত এবং সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল ঃ

"সিনেটের এই বিশেষ সভা ৯-২-৮৯ তারিখে অর্থাৎ ডাকসু নির্বাচনের পরের দিন ছাত্রী মিছিলের উপর হামলার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং হত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে। এই সভা এ সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানাচ্ছে।"

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এখন আমরা নামাজ অথবা চা-নাস্তা অথবা উভয়ের জন্য দশ মিনিট বিরতিতে যেতে পারি। মাননীয় সদস্য সদস্যাবৃন্দের দৃষ্টি আমি আবার আকর্ষণ করছি। এখনো নামাজের সময় হয়নি। আসরের নামাজের সময় চলে গেছে। এবং মাগরেবের নামাজের সময় এখনো হয়নি। অতএব, উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়নের জন্য আপনাদের প্রস্তাব এখন আপনারা উপস্থাপন করতে পারেন।

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়নের জন্য আমার একটা প্রস্তাব আছে। উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়নের জন্য আমি যে তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের নাম প্রস্তাব করছি তাঁরা হলেন—

১। ড. এ,এফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। ড. এমাজউদ্দীন আহমদ,
প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. ওয়াকিল আহমদ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ প্রার্থীদের লিখিত সম্মতি দিতে হবে।

ড. আলোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রার্থীদের লিখিত সম্মতি আমার কাছে আছে। সেগুলো আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(অতঃপর উল্লেখিত তিনজন প্রার্থীর লিখিত সম্মতি মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করা হয়)

ড. মোঃ এনামুল হক ঃ আমি উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপকের নাম প্রস্তাব করছি। তাঁরা হচ্ছেন—

১। ড. আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ড. এম, আমিনুল ইসলাম
অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. খন্দকার বজলুল হক ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ দয়া করে প্রার্থীদের লিখিত সম্মতি আমার নিকট পাঠিয়ে দিন।

(অতঃপর উক্ত তিনজন প্রার্থীর লিখিত সম্মতি মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করা হয়)।

জনাব চেয়ারম্যান, মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ আপনাদের আর কারো কি কোনো প্রস্তাব আছে? আর কোনো প্রস্তাব আছে? আর কি কোনো প্রস্তাব আছে?

(কোনো সদস্যই আর কোনো প্রস্তাব করেননি।)

তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আর কারো কোনো প্রস্তাব নেই আমাদের এখানে উপাচার্যের প্যানেল যেভাবে মনোনীত করা হয় তার অর্ডিন্যান্সের একটি অনুলিপি আপানাদের কাছে দেয়া হয়েছে আপনাদের ঢোকার সময়। এতে আপনারা দেখেছেন প্রস্তাব সমর্থন এবং সম্মতি পাওয়ার পর যেটা করা হয় তা হচ্ছে যে রেজিস্ট্রার প্রার্থীদের নামগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন। কেননা আমাদের অর্ডিন্যান্স যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক তাতে একটি বিষয় রয়েছে যে ভোটদানের জন্য আমাদের নাম লিখে দিতে হয়। যাঁকে আপনি মনোনীত করবেন তাঁর নাম লিখে দেবেন। এই ধরনের একটি ভোটদান পত্র অবশ্য আপনাদের হাতে দেয়া হবে। সেটা এখনই নয় আগে আমরা হাউসের উপস্থিত সংখ্যা কত গুনবো এবং অন্যদেরকে হাউসের বাইরে যেতে বলবো, তারপর।

ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী ঃ মাননীয় সভাপতি, নাম লিখে দিতে হবে এটা আমরা গ্রহণ করি না।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ এটা আইন। এটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। যে আইন লেখা আছে সে অনুযায়ী বরাবর হয়ে আসছে তার ব্যতিক্রম করে এটাকে অবৈধ করা যাবে না।

নির্বাচনের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়নের জন্য ভোট গণনা এবং ফলাফল চূড়ান্ত করবেন—নিম্নোক্ত দু'জন স্ক্রুটিনিয়ার।

১। জনাব আমীন উল্লাহ,

ল' রিটেইনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন।

উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁদেরকে সহায়তা করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং সিনেটের সচিব।

এখানে চারটি বুথ আছে। আপনারা সেখানে যাবেন এবং গিয়ে যাঁদের আপনারা ভোট দেবেন তাঁদের নাম লিখে দিবেন। তারপর এসে, সামনে বাক্স রাখা আছে এই বাক্সের মধ্যে ফেলে দেবেন। বোর্ডে নাম লেখা হলে নাম লেখা সম্বন্ধে আমি ব্যাখ্যা দেব। এখন বোর্ডে নাম লেখা হচ্ছে।

হাউস মুলতবি করা হচ্ছে না, তবে আপনাদেরকে চা-নাস্তা দেয়া হচ্ছে। নামগুলো লেখা হলেই I shall call the meetting to order, আপনাদের কাছে ভোটদান পদ্ধতির যে বিধির কপি দেয়া হয়েছে তাতে লেখা আছে—

After distribution of the ballot papers among the members, each member may record his vote by writing the names of person for whom he votes,

এটাই আমাদের প্র্যাকটিস্। বরাবরই এই নিয়ম অনুযায়ী হয়ে আস্ছে। এটা সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রণীত অর্ডিনেন্স।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি। তার আগে আমি অনুরোধ করব যে এখানে সিনেট সদস্য, সিনেটের সচিব এবং ল' রিটেইনার জনাব আমীনউল্লাহ এবং এছাড়া জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, উপ-রেজিস্ট্রার, জনাব মোহাম্মদ সেলিম, উপ-রেজিস্ট্রার, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, সহকারী রেজিস্ট্রার এবং জনাব সৈয়দ রেজাউর রহমান, সহকারী রেজিস্ট্রার ছাড়া আর সকলকে আমি হাউসের বাইরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

ড. মোঃ এনামুল হক ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি যেহেতু বলেছেন যে আমি যখন ভোটদান করব তখন প্রার্থীদের নাম লিখবো। এতে আমাদের অনেকের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি এ সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলে দেবো। আমি পুরোটা বলে দিচ্ছি, তারপরে যদি আপনাদের জানার থাকে পরে বলবেন।

ড. মোঃ এনামুল হক ঃ আমি আমার বক্তব্য পেশ করি। তার সঙ্গে যদি আপনারটা মিলে যায় ভালো কথা। আপনি দয়া করে আমারটা শুনে নিন। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় সেটা যেন গ্রহণ করা হয়। ছোট খাট ভুল-ভ্রান্তি। যেমন আপনার নামের শেষে মিঞা না লিখলে যদি দু'জনেই মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝে নেবো যে দু'জনকেই ভোট দেয়া হয়েছে। এই ধরনের ভুল আর কি।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, এটা হতে পারে না।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ ড. এনামুল হক যা বলেছেন তাতে আমারই সুবিধা।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভোটের কতকগুলো বিধিবদ্ধ নিয়ম রয়েছে। তারমধ্যে একটা বিশেষ নিয়ম সেটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বক্ষেত্রে পালন করে আসছি, সেটা হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা অর্থাৎ প্রত্যেক ভোটারকে গোপন বুথের ভেতরে গিয়ে ভোট দিতে হবে। বাইরে বসে যদি কেউ Prefer করেন তাহলে সেটা চলবে না কারণ সেটা নিয়মের মধ্যে পড়ে না। কেননা গোপন ব্যালটের একটা শর্ত হলো বুথের ভিতরে যেয়ে ভোট দিতে হবে। আমি মনে করি, এতে যদি কোনো সম্মানিত সদস্য মনে করেন যে তাঁর গোপন করার কিছু নেই তাহলেও তিনি বাইরে বসে ভোট দিতে পারবেন না। এটাই বিধিগত নিয়ম হওয়া উচিৎ।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আপনারা যখন ভেতরে ঢোকেন তখন যে স্বাক্ষর করেছেন তাতে আমরা বাহাত্তর (৭২) জনের স্বাক্ষর পেয়েছি। এবারে আমাদের অফিসাররা যাঁরা আছেন তাঁরা এখানে সঠিকভাবে গণনা করে দেখবেন যে কতজন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত আছেন।

মিসেস সৈয়দা শামসে আরা হোসেন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান, আমরা প্রার্থীদের যে টাইপ করা তালিকা পেয়েছি সেটা আমরা নিয়ে বুথে ঢুকতে পারব কিনা? এতে কোনো বিধি নিষেধ আছে কি না?

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, শুনে দেখা যাচ্ছে আমরা সর্বমোট বাহাত্তরজন সদস্য/সদস্যা হাউসে উপস্থিত আছি। এখন ব্যালট বাক্স খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই নির্বাচনে স্ক্রুটিনিয়া হিসেবে থাকবেন:

১। জনাব আমীন উল্লাহ,
ল' রিটেইনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন,
উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনেটের সচিব এবং নিম্নোক্ত অফিসারবৃন্দ স্ক্রুটিনিয়ারদ্বয়কে সহায়তা করবেন—

১। জনাব মুহম্মদ সেলিম,
উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন,
সহকারী রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। জনাব সৈয়দ রেজাউর রহমান,
সহকারী রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ প্রার্থীদের নাম নিয়ে একটু বিভ্রান্তি আছে এটা আমিও বুঝতে পারছি। তবে আমার মনে হয় এটা কোনো বড় কিছু নয় যে আপনারা বুঝতে পারবেন না। নামগুলোর মধ্যে দুই জোড়া নাম আছে প্রায় একই রকম। একজোড়া আছে :—আমিনুল ইসলাম। এঁরা দু'জনই সিনেট সদস্য। একজন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম। তাঁর নিচে যাঁর নাম আছে তিনি ড. এম, আমিনুল ইসলাম, তিনি ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক। এই দু'জনের নামের মধ্যে তফাত হলো প্রথম জনের নামে 'এম' নেই, পরের জনের নামে 'এম' আছে। আর এক জোড়া নামের বিভ্রান্তি রয়েছে। এটা আমার নামের সাথে সংযুক্ত। এখানে আপনারা একটি নাম দেখতে পাচ্ছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি এই সিনেটের সদস্য নন। আর ঐদিকে আর একটি নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় নামটি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা। ঐ নামটি এই গরীবের। আমার বিভাগ ভূগোল। এই নাম দু'টির মধ্যে আমার নামের শেষে মিঞা আছে অপর জনের নামের শেষে মিঞা নেই। ভোটদানের সময় নামের সঙ্গে বিভাগ লেখার প্রয়োজন নেই। আপনারা শুধু নাম লিখে দিবেন। আপনাদেরকে যে ভোটদান পত্র দেয়া হবে তাতে তিনটি ঘর আছে।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ সংকট এড়ানোর জন্য আমার মনে হয় যে, নামের সঙ্গে সঙ্গে নম্বর দিয়ে দিলে অনেক ভালো হতো।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ নম্বর দিলে আবার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। কারণ ঘর আছে মাত্র তিনটি। নামের সঙ্গে বিভাগ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছে তাঁদের কোনো রকম বিভ্রান্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। একটি নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা। আর একটি নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। একটি নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা। আর একটি নাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। 'ণ' এবং 'ন'-তে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ বাংলা টাইপে এ পার্থক্য বোঝা মুশকিল। এ দুই অক্ষরের শুদ্ধতা বাংলাদেশে কখনো করা যাবে বলে মনে হয় না। এবারতো আপনারা বুঝেছেন, এখন যে সকল সদস্য/সদস্যা উপস্থিত আছেন তাঁদের নাম আমি ক্রমানুসারে ডাকবো। আপনারা

স্ক্রুটিনিয়ারদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে বুথে যাবেন। সেখান থেকে ভোটদান শেষ করে এসে ব্যালট Paper বাক্সে ফেলে দেবেন। আমি, উপ-উপাচার্য মহোদয় এবং কোষাধ্যক্ষ সাহেব আমরা তিনজনই ভোটার কিন্তু আমরা শেষে ভোট দেব।

ভোটদান

অতঃপর যথারীতি ভোটদান পর্ব সমাধা হয়।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আর কি কারো ভোট দেয়া বাকি আছে? আমার মনে হয় আর কারো ভোট দেয়ার বাকি নেই। এবার বাক্স খোলা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পারেন।

ভোট গণনা

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের ভোটদান শেষ হওয়ার পরপরই ব্যালট বাক্স হাউসের মাঝখানে রক্ষিত স্ক্রুটিনিয়ারদের টেবিলে উঠানো হয়। মাননীয় চেয়ারম্যানের আদেশে প্রার্থীদের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য অফিসারদের সহায়তায় স্ক্রুটিনিয়ারদ্বয় ভোট গণনা করেন এবং ভোটের ফলাফল চূড়ান্ত করে মাননীয় চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করেন।

ফলাফল ঘোষণা

জনাব চেয়ারম্যান ঃ মাননীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, আপনারা অনুমতি দিলে নির্বাচনের ফলাফল আমি এখন ঘোষণা করতে পারি। যেভাবে এখানে নাম লেখা আছে সেভাবেই আমি আগে বলছি। তারপর নির্বাচিতদের নাম উল্লেখ করব। আমি প্রত্যেক প্রার্থীর নাম বলছি এবং কত ভোট পেয়েছেন তাও বলছি।

প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা
১। ড. এ,এফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।	৩১ (একত্রিশ)
২। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা।	৪৭ (সাতচল্লিশ)
৩। ড. এমাজউদ্দীন আহমদ।	৩৬ (ছত্রিশ)
৪। ড. আমিনুল ইসলাম	২৯ (উনত্রিশ)
৫। ড. এম, আমিনুল ইসলাম।	২৭ (সাতাশ)
৬। ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।	২৯ (উনত্রিশ)

এঁদের মধ্যে আমরা নির্বাচিত ঘোষণা করছি—

১। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা।

২। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ।

৩। অধ্যাপক এ.এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

(উপস্থিত সকলে করতালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।)

উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল মনোনয়ন

সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ১১ (১) অনুযায়ী, চ্যান্সেলর কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য আজকের সিনেট অধিবেশনে উপস্থিত সদস্য/সদস্যাদের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তিনজনের প্যানেল মনোনীত করা হলো ঃ—

১। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা ৪৭ (সাতচল্লিশ)

২। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ ৩৬ (ছত্রিশ) ভোট

৩। অধ্যাপক এ.এফ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (৩১) একত্রিশ।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের আজকের অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের কথা ছিল যে আপনি কতকগুলো বিষয় আলোচনা করবেন, এই মূল বিষয় আলোচনা শেষ হওয়ার পর। যদি তা না হয় তা হলে আমি বলবো আমাদের অধিকার খর্ব হচ্ছে।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ না, এ রকম কথা ছিল না। গোটা হাউস এভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ছাত্রী মিছিলে হামলা এবং সন্ত্রাসের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা এজেন্ডায় চলে যাব। আপনি হাউসকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মাননীয় সদস্য এটা আমি Close করে দিয়েছি।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ তাহলে আমি বলবো আপনি আপনার Discretion ব্যবহার করেছেন।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ আমি আমার Discretion ব্যবহার করিনি। সকলের সম্মতি নিয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

জনাব কে.এ.এম. সাদউদ্দিন ঃ আমি যেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেটা খুবই জরুরি ছিল।

জনাব চেয়ারম্যান ঃ অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত।

অধিবেশন সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটের সময় শেষ হয়।

স্বাক্ষর/ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা,
চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষর/আ,জ, শিকদার
সেক্রেটারি

❑